দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১৭ সংখ্যা ❖ ১৭ জানুয়ারি ২০২৬

লালন ফকির

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ

● লালন ফকির ও সুফিবাদ — তানভীর মোকাম্মেল — ৩

● শিক্ষা সংকট — সিদ্ধার্থ সেন — ৪

আন্তর্জাতিক

● লাতিন আমেরিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপ — শুভ বসু — ৮

● ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্পের অপহরণ — সৌর বসু — ১০

● ইরানের মানুষ এখন কঠিনতম লড়াই — মনিরুল হক — ১১

● মার্কিনি হুমকির কাছে বিশ্বগুরুর অসহায়তা — অমিত দাশগুপ্ত — ১৪

বাংলাদেশ

● বাংলাদেশের কারাগারে রাজনৈতিক হত্যা — তসলিমা নাসরিন — ১৬

ইতিহাস

● ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র — মজিবুর রহমান — ১৭

● ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ১৯

পরিবেশ

● সংক্রমিত পানীয় জল খেয়ে মৃত্যুর মিছিল — রাহুল রায় — ২২

স্মরণ

● অর্ঘ্য সেন — ২৫

● সমীর পুততুণ্ড — ২৫

ধারাবাহিক

● জরুরি অবস্থা : জনতা সরকারের ব্যর্থতা ও পতন — সুশান্ত দাশগুপ্ত — ২৬

দেশের খবর

● এখন জেলই আমার জীবন – উমর খালিদ — অমিতাভ সিংহ — ২৮

● বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর তাণ্ডব হিন্দুত্ববাদি শক্তির — সুকুমার মিত্র — ৩০

● ভোটাধিকার বনাম লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি — সুকুমার মিত্র — ৩১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

● বন্ধুতার পাতা — সংকলক -শুভেন্দু দাশগুপ্ত — (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

প্রচ্ছদ ঃ নন্দলাল বসু

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কোন পথে

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয় ও বিপুল সংখ্যক মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে । পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ - এই রূপান্তরের পিছনে ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস । যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই সংগ্রামের রাস্তা মসৃন ছিলো না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে পাকিস্তান নামক যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয় তারই একটি দূরবর্তী অংশ ছিলো পূর্ব বাংলা। ১৯৫৫ সালে পাক শাসকরা এই অংশের নামকরণ করেন পূর্ব পাকিস্তান। এর আগেই তারা ঘোষণা করেছিল বাংলা নয় , উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা । যে ঘোষণার বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন।

আসলে পূর্ব বাংলার মানুষ নতুন করে নিজেদের জাতি সত্তার অনুসন্ধান শুরু করেছিল। ভাষা ছিলো যার অন্যতম প্রধান ভিত্তি ।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লিগ ও তাদের সহযোগীদের বিপুল ভোট পেয়ে পরাজিত করে আওয়ামি মুসলিম লিগ , কৃষক প্রজা পার্টি ও পূর্ব বাংলার কংগ্রেসের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় ।প্রধানমন্ত্রী (তখন এই Designation ছিল) হন এ কে ফজলুল হক। মনে রাখতে হবে এই নির্বাচনের মাত্র আট বছর আগে ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম লিগ বিপুল ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিল। বোঝা গেল পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ক্রমশ মুসলিম লিগের সম্পর্কে মোহমুক্ত হচ্ছে ।কিন্তু এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পাকিস্তানি শাসকরা এক বছর পরই ক্ষমতাচ্যুত করে। পূর্ব বাংলার মানুষ তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। এর পর থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচিতে গণ আন্দোলন চলতে থাকে। এই সব গণ আন্দোলনে জনসাধারণের সঙ্গে ছাত্ররাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।ততদিনে আওয়ামি মুসলিম লিগ রূপান্তরিত হয়েছে আওয়ামি লিগ- এ। তার নেতৃত্বে শেখ মুজিবর রহমান ও মাওলানা ভাসানী । বাংলা ভাষার অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গীত , সাহিত্য , চিত্রকলা , সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রেই নতুন জোয়ার আসে ।পাক শাসকদের সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রবীন্দ্র সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে শিল্পীরাও গণ আন্দোলনে সামিল হন । সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রয়োগ করেও জনমানুষের ঐক্য শাসকরা ভাঙতে ব্যর্থ হয় ।১৯৬৮ সালে বিশাল গণ আন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন ।ক্ষমতায় বসেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান । ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ জাতীয় সংসদে সর্বাধিক আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলেও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু করে । এর পরের ঘটনা কারো অজানা নয় । ৯ মাসে পাক সেনারা ব্যাপক গণহত্যা চালায় ।৩০ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে ।পাক সেনা ও সহযোগী রাজাকার বাহিনী অন্তত তিনলক্ষ মা ও বোন কে ধর্ষণ করে । ১ কোটি মানুষ প্রাণের আশঙ্কায় ভারতে এসে আশ্রয় নেয় ।পাক সরকারকে অন্ধ ভাবে মার্কিন - চিন অক্ষশক্তি সমর্থন করে । মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় ।প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এই সময়ে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় দেন ।পাক সেনা পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করলে যুদ্ধ শুরু হয় ।মাত্র ১৩ দিনের মধ্যে ঢাকার পতন হয় । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহৌর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন ।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের এই অর্জনকে বানচাল করবার জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের মধ্যে ও সেনাবাহিনীর মধ্যে আত্মগোপন করে ছিলো ।মার্কিন গুপ্তচর সংস্থারও হাত ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাসভবনে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় । তাঁর দুই কন্যা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। ৩ নভেম্বর চার জাতীয় নেতাকে ঢাকা জেলে হত্যা করা হয় । এরপর ১৯৭৫ - থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ওই দেশে সামরিক শাসন ছিলো। এই সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের যা কিছু অর্জন তা ধ্বংস করার ধারাবাহিক চেষ্টা হয়েছে। রাজাকার ও জামাত এ ইসলাম দলকে আবার দেশে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ও ২০০৯ সালে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসেন । তিনি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েই ক্ষমতায় ছিলেন । ২০২৪ সালের তথাকথিত জুলাই বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে একটি প্রতিবিপ্লব । ছাত্রদের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী চরম সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় এসেছে । পিছনে ছিলো সামরিক বাহিনী ও সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদি ডিপ স্টেট । তথাকথিত প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস নিজেই স্বীকার করেছেন Meticulous Planning „ রেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে ।আর তিনি Reset button টিপে দিয়েছেন ।আর মুক্তিযুদ্ধের কোনও চিহ্ন থাকবেনা।

মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত স্থাপনা , ভাস্কর্য সব ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি সরকারি বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে । দেশে চলছে মবতন্ত্র । সমস্ত সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত । আক্রান্ত বাউল - ফকিররা , পীরদের মাজার, আদিবাসীরা ।চলছে অবাধে লুঠ তরাজ, ডাকাতি । ওসমান হাদি নামে এক জিহাদি নিহত হয়েছে । তাকে গোর দেওয়া হয়েছে বিদ্রোহী কবি নজরুলের সমাধির পাশে ।কি বলবেন ? দেশের বৃহত্তম দল আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ । এর মধ্যে হচ্ছে নির্বাচন ।

বাংলাদেশ কোন পথে ?

প্রবন্ধ

লালন ফকিরের উপর সুফিবাদের প্রভাব

তানভীর মোকাম্মেল

[লেখক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক তিনি একই সঙ্গে সাহিত্য . সমাজ, সঙ্গীত, লোক — সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধকার। লেখক এই বিষয়ের ওপর তাঁর এই বক্তৃতাটি ইংরেজি ভাষায় প্রদান করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুবাদ লেখকের নিজস্ব। অতীব মূল্যবান এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। আজ প্রবন্ধটির চতুর্থ ও শেষ কিস্তি প্রকাশিত হল। — সম্পাদক, নাগরিক]

(৪)

ইদানীং অবশ্য বাউলদের ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ মধ্যবিত্তদের অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে জাতীয়তাবাদী আলোচনার বয়ানগুলিতে দেখি লালনের 'বাউল' উপাদানগুলিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং লালন ফকিরের উপর তফকিরীদ বা সুফি প্রভাবকে হয় পুরোপুরি অবহেলা অথবা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে একই সঙ্গে লালনের উপর সুফি মতবাদের প্রভাবের বিষয়টিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়াটাও তেমন ঠিক হবে না। কারণ তসহজ মানুষদ, তঅধর মানুষদ, তঅচিন মানুষদ, তমনের মানুষদ অথবা তসোনার মানুষদ, এসবই হচ্ছে এক কৌশলী ও ছলনাময় স্রষ্টার নানা নাম, যাঁকে একটা বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ধরণের যৌনসাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধরা সম্ভব এবং তাঁকে সেভাবে ধরতে পারলে এক নীরোগ সুন্দর দেহ, এমনকী অমরত্ব লাভ করা যেতে পারে। আগেই বলেছি লালনের এসব ধারণার উৎস মূলত এদেশীয় সহজিয়া দেহতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং পারস্যের সুফিবাদের সঙ্গে এসবের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। সুফি ধারণায় স্বর্গীয় আলো বা তনূর-ই-মোহাম্মদদ-য়ের ধারণা কখনো কখনো লালনের গানে দেখা গেলেও লালন ফকির ও তাঁর অনুসারীদের সৃষ্টিতত্ত্ব মূলত এদেশে ইতিমধ্যে প্রচলিত নাথ-তান্ত্রিক-সহজিয়া দেহতান্ত্রিক সাধনচর্চার উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল। লোকজ এই বিশ্বাসের জগতটি মধ্যপ্রাচ্যের সুফি বিশ্বাসের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে একেবারেই আলাদা এক জগৎ। লালন ফকিরের উপর সুফি বিশ্বাস ও চর্চার প্রভাব অবশ্যই কিছুটা ছিল, কিন্তু লালনের জীবনবীক্ষার মূল রূপটি গড়ে উঠেছিল যুগ যুগ ধরে এ মাটিতে প্রচলিত যোগ-তান্ত্রিকতার ধ্যান-ধারণা থেকে যার সঙ্গে এসে মিশেছিল নদীয়ার বৈষ্ণবদের চৈতন্য-পরবর্তী যুগের সহজিয়া সাধনচর্চা। মনে রাখতে হবে, লালন ফকির এই নদীয়া অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন।

সুফিবাদ তথা একটা ধর্ম হিসেবে ইসলাম দ্বারা লালন ফকির কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই বিষয়টি গবেষণার জগতে এখনও অনেকটাই এক অজানা জগত। তবে এটা ধারণা করার কারণ রয়েছে যে, যেহেতু মুসলমানেরা ছিলেন তাঁর চারপাশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, ফলে ধর্মান্ধ ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরপেক্ষ বা বন্ধুসুলভ রাখার জন্যেই হয়তো লালন ফকির হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে নিয়ে নবীতত্ত্বের বেশ কিছু গান লিখেছিলেন এবং অনেক ইসলামী উপমা ও পদ ব্যবহার করেছেন। আমরা অর্ধ শতাব্দী পরে দেখব যে আরেকজন ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী বাঙ্গালি কবি কাজী নজরুল ইসলামও হাম্‌দ ও নাতের মতো অনেক ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন। ১১২৮২

সুফি আউলিয়াদের বায়বীয় আধ্যাত্মিক প্রেম-ভালোবাসার ঈশ্বরের সঙ্গে লালন ফকিরের 'অচিন মানুষ'-য়ের সর্বপ্রাণবাদী ঈশ্বরের ধারণার প্রতিতুলনার সময় এটা মনে রাখতে হবে যে লালন ও ওঁর বাউল-ফকির অনুসারীরা ছিলেন সমাজ-বহির্ভূত নিম্নবর্গের শ্রেণীর মানুষ যাঁরা গ্রামবাংলার দরিদ্র কৃষক-তাঁতী-মাঝি ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মাঝে বাস করতেন। যেহেতু বাউল-ফকিরদের প্রধান উপার্জনই ছিল মাধুকরী বা ভিক্ষাবৃত্তি, ফলে তাঁরা গ্রামীণ দরিদ্র অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। নিজেরাও দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষ হওয়ার কারণে মানবদেহের গুরুত্বটা তাঁরা বুঝতে পারতেন। মানবদেহ, এই একটা মাত্র সম্পদই তাঁদের ছিল। তাই এটা আশ্চর্যের নয় যে বায়বীয় প্রেমে বিশ্বাসী সুফি সাধকদের তুলনায় গ্রামবাংলার বাউল-ফকিরেরা ছিলেন অনেক বেশী দেহকেন্দ্রিক বাস্তব মানুষ। অন্য দিকে সুফি সাধকেরা অনেকেই ছিলেন নগরবাসী অথবা গ্রামীণসমাজের উপরের অংশের সচ্ছল অধিবাসী। অষ্টাদশ-উনিশ শতক দুটি বাংলার দরিদ্র মানুষদের জন্যে কোনো সুখী সময় ছিল না। লালনের অনেক গানেই তাই আমরা পাই নানা রকম বঞ্চনার উল্লেখ। দারিদ্র্য ও সর্বব্যাপ্ত এই বঞ্চনার কথা লালনের গানে বেশ বড়ভাবেই এসেছে এবং এসেছে বারবারই যা ওঁর জীবনদর্শনে একটা গভীর বিষন্নতা ও দুঃখবোধকে ছড়িয়ে রেখেছে ;

'আশা পূর্ণ হোল না
আমার মনের বাসনা।।
বিধাতা সংসারের রাজা
আমায় করে রাখল প্রজা
কর না দিলে দেয় গো সাজা
কারো দোহাই মানে না।' ১১৩

লালন আরো গাইছেন ;

'এই দেশেতে এই সুখ হোল আবার কোথায় যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি।।'

জাতিভেদপ্রথাবিরোধী বেশ কয়েকটি গান রয়েছে লালন ফকিরের যা জাতিভেদের প্রতি, বা যা কিছুই মানবজাতিকে বিভক্ত করে রেখেছে, সে সবের প্রতি ওঁর ঘৃণাকে প্রকাশ করেছে। হিন্দুধর্মের অমানবিক বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বর্ণপ্রথাকে ধারিত ও চালিত করে যে কর্তৃত্ববাদী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের শ্রেণীগুলি, তাঁদের বিরুদ্ধে লালনের বিরাগ এতটাই তীব্র ছিল যে উনি ঘোষণা দিচ্ছেন যে বর্ণভেদপ্রথাকে যদি হাত দিয়ে ধরতে পারতেন তাহলে তাকে আগুনে পোড়াতেন;

'লালন কয় জাত হাতে পেলে
পোড়াতাম আগুন দিয়ে।'

মনে রাখতে হবে যে লালন ফকির ও তাঁর অনুসারীরা নিজেরাও ছিলেন সমাজের মূলধারা থেকে বিতাড়িত এক বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। লালনের গানের অনেক দুঃখ, বিষন্নতা ও অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসা আসলে বাংলার এক বিশেষ সময়কালে গ্রামবাংলার দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দুঃখবোধ ও অস্তিত্ববাদী শূন্যতারই প্রকাশ যে দরিদ্র সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন লালন নিজেও।

লালন ফকিরের কাহিনী হচ্ছে নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সৃজনশীলতা ও প্রতিবাদের কাহিনী। লালনকে নাগরিক বুদ্ধিজীবী সমাজ ও কর্পোরেট বাণিজ্য স্বার্থ আজ যতোই সমাজবিচ্ছিন্ন এক শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুক না কেন, বাস্তবতা রয়েই যায় যে বাংলার বাউল-ফকিরদের প্রতিষ্ঠানবিরোধী দর্শন, লালন যে ধারার সবচে প্রভাবশালী সঙ্গীতগুরু, এমন এক শক্তি যাকে উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠানসমূহকে হিসেবে রাখতেই হবে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নীচুতলায় লালন ফকিরের প্রভাব আজো ব্যাপক। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসারের ক্ষেত্রে এটা এক বড় ইতিবাচক উপাদান। এবং হয়তো মানবতাবাদী বিশ্বাসের এই অন্তঃস্রোতটিই বাংলাদেশকে বাঁচাবে আরেকটি আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হওয়ার বিপদ থেকে এবং আশা করা যায় মানবতাবিরোধী ইসলামী মৌলবাদীদেরও ঠেকিয়ে রাখতে তা'সহায়ক হবে।

লালনের গানের সর্বব্যাপ্ত মানবতাবাদকে কখনোই ভুলে থাকা সম্ভব হবে না। লালনের জীবনদর্শনে, কেবল মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার আনন্দটাই এমন এক ভান্ডার, যা থেকে মানবজাতি সর্বদাই শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চয় করতে পারবে। কেউ বা ভুলতে পারে মহান মানবতাবাদী লালন ফকিরের অসামান্য এই সব গান ;

'এমন মানবজনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে ।।

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে এই মানবে।।

কত ভাগ্যের ফলে না জানি
পেয়েছ এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায়, তোমার সুধারায়
যেন ভারা না ডোবে ।।

মানুষে করতে মাধুর্য ভজন
তাই মানবরূপ গঠলেন নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
লালন কয় কাতরভাবে।।'

ব্যক্তি ও শিল্পী লালন ফকিরের এই গভীর মানবতাবোধের জন্যে আমরা তাঁর উপর যে সব প্রধান প্রধান প্রভাব বিদ্যমান ছিল, মানবদেহকেন্দ্রিক বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, হিন্দু সহজিয়া বৈষ্ণববাদের প্রেম ও বিনয় এবং পরিশেষে, সুফি সাধকদের মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণা- এই সব কিছুর প্রতিই গভীরভাবে কৃতজ্ঞ রইব।

(সমাপ্ত)

শিক্ষা সংকট

সিদ্ধার্থ সেন

(১)

কিছুদিন আগে কথা হচ্ছিল এক বন্ধুর সাথে, প্রসঙ্গ রসগোল্লা। রসগোল্লার জি আই ট্যাগ কে পাবে, বাংলা না উড়িষ্যা? দুই তরফেই জোর দাবি, রসগোল্লার উদ্ভব হয়েছে তাদের রাজ্যেই। তাদের সমর্থনে রাজ্যের লোকও অনেকে সোচ্চার হয়েছে। বন্ধু বললো, 'আমার চাকুরি জীবন পুরোটাই কেটেছে অভিভক্ত মেদিনীপুর জেলায়; যেটা ওই সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহলে আমি কার হয়ে বলব? আর রসগোল্লার উদ্ভব তো একদিনে হয়নি, দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন লোকের প্রচেষ্টায় রসগোল্লা তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। আর

কৃতিত্ব কাউকে দিতে হলে তো প্রথমে পর্তুগিজদের দিতে হয়। কারণ আগে ভারতবর্ষের লোকেরা ছানা বানাতে জানত না। পর্তুগিজরাই এদেশে এসে প্রথমে দুধ কেটে ছানা বানানো শিখিয়েছে। তাহলে কাকে কৃতিত্ব দেব?'

একটা কথা পরিষ্কার হল, প্রাচীন কোনো জ্ঞানের উৎপত্তির সঠিক সময় ও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ণয় করা মুশকিল। আর একটি আবিষ্কারের পেছনে প্রাচীন কাল থেকে দীর্ঘ সময় ধরে নানা মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা কাজ করেছে। মানুষ যুগ যুগ ধরে এই জ্ঞান আহরণ করে এসেছে আর তা বাকি মানুষের সাথে ভাগ করে নিয়ে এসেছে।

প্রাচীন যুগে এই জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার কোনও পদ্ধতি আবিষ্কার হয় নি। তাই তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর লিপি আবিষ্কারের পরে সেগুলি লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করার চল হয়। কাগজ ও কালি ব্যবহার শুরু হওয়ার পরে তার জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে। এই আহরিত জ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনেই শুরু হল শিক্ষাদান। প্রথম যুগে এই শিক্ষাদান পদ্ধতির কোন নির্দিষ্ট আঙ্গিক ছিল না। গুরুর বাড়িতেই ছাত্রের পড়াশোনার ব্যবস্থা হত। আমাদের দেশে কখনও তাকে বলা হত টোল, কখনও পাঠশালা, বা চতুষ্পাঠী, কখনও বা গুরুকুল। পড়ানো হত মুখে মুখে, ছাত্রদের তা মুখস্ত করতে হত। মূলতঃ ধর্মগ্রন্থগুলি তাতে পড়ানো হতো, আর সেই সাথে কিছু পাটিগণিত। কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস তাতে ছিল না। এ ছাড়াও হাতে কলমে কাজ শেখার জন্যেও ছাত্ররা বিভিন্ন গুরুর কাছে যেত।কেউ যেত অস্ত্র শিক্ষা করতে, কেউ যজমানি , কেউ বা কামারশালায়। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে একটু বড় স্কেল-এ তৈরি হল কিছু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র।সেখানে দূর দূর থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। কাশী, নবদ্বীপ ইত্যাদি জায়গাগুলি এইভাবে জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠল।

এই সব পাঠশালা বা টোলের যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তা হল, গুরু যা বলবে তা বেদবাক্য বলে গণ্য করবে। তার বাইরে তাকাতে যেও না। কিন্তু এর মধ্যেই এসে পড়লেন বুদ্ধ। তিনি বললেন, কোন কিছুই বিশ্বাস কোরো না। হতে পারে, তা তোমার গুরু বলেছেন। হতে পারে, তোমার মা বাবা কেউ বলেছেন; হতে পারে তুমি স্বপ্নে এই বার্তা পেয়েছ। সমস্ত কিছুই আগে নিজের বিচার বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবে। তারপর যদি মনে হয় এটা সমস্ত মানুষের ভালোর জন্য উপযোগী, তবেই তাকে গ্রহণ করবে।

বুদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না। বলা যায়, তাঁর উপদেশ থেকেই যুক্তিবাদের পত্তন হয়। সেই সাথে জ্ঞানচর্চার পরিধিও বেড়ে যায়। এই সময়েই সুশ্রুত, চড়ক , জীবক, ইত্যাদি শল্যবিদ ও ভেষজ বিজ্ঞানী বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এই সাথে জ্ঞানচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা হয় তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, নালন্দা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের। দেশবিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা এসে থাকত এখানে। ছিল ক্লাসরুম, পাঠাগার ইত্যাদি। পড়ানোর বিষয়ের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও ছিল সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়। মধ্যযুগের শুরুতে (একাদশ শতাব্দীর শুরু বলে ধরে নিলে) বুদ্ধধর্মের চর্চায় একটা ভাঁটা পরে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজারাজরাদের পৃষ্ঠপোষকতাও কমে যায়। এগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

জ্ঞানচর্চার এরকম কেন্দ্র শুধু প্রাচীন ভারতেই ছিল না। সভ্যতার সাথে সাথে সারা বিশ্বে নানা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ, প্রাচীন গ্রিস। সেখানে প্রায় একই সময়ে জন্মেছিলেন প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল। আর্কিমিডিস ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ার। খ্রিস্টপূর্ব তিনশো শতকে জন্ম নেন গণিতবিদ ইউক্লিড। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর কাছে গণিতের পাঠ নিতে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর শিষ্য এসেছিলেন । সেই সাথে সেখানে গড়ে উঠেছিল আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল পাঠাগার। ইউক্লিড -ই প্রথম জ্যামিতিক সূত্রগুলি সূত্রবদ্ধ করেন। সেই সাথে Axiom– Postulate– Theorem– Proof ইত্যাদি পদ্ধতির প্রস্তাব করে গণিতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যের বাগদাদ ছিল জ্ঞানচর্চার আর এক কেন্দ্র। মধ্যযুগে ইউরোপ চার্চের অধীনে বিভিন্ন ধর্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু হয় এইভাবেই। এসব জায়গায় তখন ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পড়ান হত। ডারউইন, মেন্ডেলের মত বিজ্ঞানী এই সব ধর্মচর্চার প্রতিষ্ঠান থেকেই উদ্ভূত। পরের দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চার্চের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করে এবং এইসাথে স্বাধীনভাবে পাঠ্যসূচির উপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। তারপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ও নিয়মকানুনের উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেশিরভাগ দেশেই ন্যূনতম।

প্রাচীন ভারতে জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার অন্যতম বাধা ছিল লেখার সামগ্রী সংরক্ষণ করার সুযোগেরর অভাব। আর্দ্র আবহাওয়ায় তালপাতার পুঁথি দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যে, মিশরে বা তিব্বতে শুকনো আবহাওয়া। সেখানে পার্চমেন্ট কাগজ ইত্যাদির উপর লেখা অনেকদিন অবিকৃত থাকত। এর ফলে পরবর্তীকালে ও সব জায়গায় অনেক হাতে লেখা পুঁথি আবিষ্কার হয়েছে। এ ছাড়াও ভারতে জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা নষ্ট

হয়ে যাবার আর একটি বড় কারণ শিক্ষাকে নিজের জাতের বা বংশের লোকেদের মধ্যে কুক্ষিগত রাখার প্রবণতা। ফলে জ্ঞানচর্চার পরিধি হয়ে গেছে সংকীর্ণ। গুরুর মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারো নেই। বরং 'সবই ব্যাদে আছে' এই ধারণাটাই সবাই বদ্ধমূল করে রেখেছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তাই আজকের দিনেও বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে, গনেশের মাথা প্লাষ্টিক সার্জারি করে বসানো হয়েছে, প্রাচীন ভারতে পুষ্পক রথ আবিষ্কার হয়েছিল এবং এতে করে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া যেত, ইত্যাদি অর্বাচীন কথা। প্রাচীন) edic Mathematics নিয়ে আজকাল অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু সেগুলি আদতে পাটিগণিতের কিছু অঙ্ক দ্রুত সমাধান করার পদ্ধতি ছাড়া কিছু নয়। আজকের দিনে কম্পিউটার আসার পরে এর ব্যবহারিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তার উপরে এগুলোতে শুধু অঙ্ক দ্রুত করার পদ্ধতি বলা আছে, কিন্তু সেটি কি করে হলো বা তার প্রমাণ দেওয়া নেই।

বুদ্ধের উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গিয়ে, সমস্ত কিছু প্রশ্ন না করে মেনে নেওয়ার প্রবণতা একটি অপবিজ্ঞান মনস্কতা। আজকের দিনে নতুন শিক্ষানীতির পাঠক্রমে Indian Knowledge System এই রকম একটি গল্পকথার সংস্করণ। এরা প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান কত উন্নত ছিল তার বিবরণ নানা রকম রং চড়িয়ে দেয়, কিন্তু বিজ্ঞানের মূল বিষয়, অর্থাৎ কেন এবং কিভাবে, তার উত্তর খোঁজার কোন দিশা দেয় না। কোন শাস্ত্রে পুষ্পক রথের বর্ণনা আছে, তা বিশদ করে বলা, কিন্তু কিভাবে তা কাজ করত তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয় না। অরে বাবা, সেই সময় এতই যদি বিজ্ঞান উন্নত ছিল, তবে এই রথ আকাশে ভেসে এগোনোর পেছনে যে Fluid Dynamics এর গূঢ় তত্ত্ব আছে, তা নিয়ে আলোচনার কিছু উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে দেখাও তো দেখি ! অথবা আজকের দিনে বৈদিক শাস্ত্র মেনে একটা পুষ্পক রথ তৈরি করে তাকে আকাশে উড়িয়ে দেখাও না তোমার বক্তব্যের সারবত্তা ! এরা কিন্তু এই রাস্তায় যাবে না; বরং তাদের গল্পকথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাঠ্য বইয়ে স্থান দেবে; আর ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাশ করবে। তাতে ছাত্রদের কি, কেন, কিভাবে - এ সব জিজ্ঞেস করতে শেখাবে না। আর এগুলোকে জায়গা দেওয়ার জন্য পড়ার চাপ কমানোর নাম স্কুলস্তরে সিলেবাসে বাদ দেওয়া হলো ডারউইনের তত্ত্ব, পিরিয়ডিক টেবিল ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার। আর এইভাবে চলতে থাকলে আগামী প্রজন্মের মধ্যে প্রশ্ন করা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রবণতাই চলে যাবে। আর আমরা প্রবেশ করবো আর এক অন্ধকার যুগে। আর এটাই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বিপদ।

(২)

মধ্যযুগে ভারতে অনেকটা সময় ধরে রাজত্ব করেছে আফগান, তুর্ক ও মুঘলরা। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা, যন্ত্রসংগীতের অনেক আদানপ্রদান ঘটে। এই সময়ে ভারত থেকে যেমন প্রাচীন গণিতশাস্ত্রের আবিষ্কারগুলি আরব পন্ডিতরা অনুবাদ করে নিয়ে যায়, তেমনি মুঘল দরবারের দারা শুকোর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা সংস্কৃত ভাষা থেকে উপনিষদ ও গীতা ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। আবার আরব দেশ থেকে অনেক ধরনের তারযন্ত্র, শিল্পকলা এই সময়ে ভারতে আসে। এই সাথে ভারতে আসে নানা ধরনের জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি, আর বাঁধ নির্মাণ ও জলসেচের পদ্ধতি। বেশ কিছু মানমন্দির ভারতে গড়ে ওঠে সেই সময়ে। কিন্তু তখনকার দিনের বিদ্বৎসমাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়েই চর্চা করতেই ব্যস্ত থাকতেন । গ্রহতারাদের কক্ষপথ নিয়ে গাণিতিক বিচার করা তাঁদের আকর্ষণ করত না। ইউরোপের মাটিতে রেনেসাঁসের আলো কিন্তু তত দিনে প্রজ্বলিত হয়ে গেছে। কেপলার, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানী গ্রহ-তারাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে মহাকর্ষের যুগান্তকারী তত্ত্ব দিলেন ও সেই সাথে তার গাণিতিক প্রমাণও দিলেন। বিভিন্ন ইউরোপিয়ান পর্যটকের মাধ্যমে ভারতের মাটিতে সে খবরও এলো অচিরেই। কিন্তু সেই আবিষ্কারের গুরুত্ব রাজদরবারের পন্ডিতেরা কেউ অনুধাবন করতে পারলো না। কাজেই এই সব যুগান্তকারী আবিষ্কার তারিফ করার মতো লোক তখন ছিল না। পারলে হয়তো আমরা শিল্প বিপ্লবের ফল তখনই ভোগ করতে পারতাম। অর্থাৎ নতুন জ্ঞান তুমি আবিষ্কার নাই বা করতে পারলে, কিন্তু নতুন আবিষ্কারকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা ও তাকে আত্মস্থ করার মানসিক প্রস্তুতিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, শাহাজাহান মারা যান ১৬৬৬ সালে, আর গ্যালিলিও মারা যান ১৬৪২ সালে। অর্থাৎ তারা ছিলেন সমসাময়িক। ১৬৬৬ সালে নিউটনের বয়স ২৩ বছর। এই বয়সেই তিনি তাঁর মেধার বলে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শুরু করে দিয়েছেন।

মধ্যযুগের শেষে, মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে যায়, বিভিন্ন ছোট ছোট অঙ্গ রাজ্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও সমানে লেগে থাকত। এরই মধ্যে এলো ব্রিটিশরা। ঝগড়াবিবাদের সুযোগ নিয়ে তারা ধীরে ধীরে গোটা ভারতবর্ষ দখল করে নিল। সাম্রাজ্য বিস্তার কালে ইংরেজদের মূল লক্ষ্য ছিল, দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাম্রাজ্য ও ব্যবসার পরিধি বাড়ানো। এইজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল কিছু দোভাষী ও কিছু করণিক যাদের মাধ্যমে দেশ চালানো যাবে। তাই শিক্ষার পিছনে

তাদের নজর ছিল না। শুধু তাদের প্রয়োজন মেটাতে রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা মাদ্রাসা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিন্দু স্কুল। কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রামগঞ্জে শিক্ষাবিস্তারে কোন নজর দেওয়া হল না। চিরাচরিত পাঠশালা ও মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থাই চলতে থাকল। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে সেকালের পাঠশালা শিক্ষার কিছুটা বিবরণ দিয়েছেন—

'পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতেখড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ করা হইল। সে সময়ে পাঠশালাতে শিশুগনের পাঠ্যারম্ভ হইত। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একটি পাঠশালা ছিল। সম্ভবতঃ সেইখানেই শিশু রামতনুর পাঠ্যারম্ভ হয়। সে সময়কার পাঠশালের কিঞ্চিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থজাতীয় গুরুগণ আসিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক, গুরুমশাই, বেত্রহস্তে মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দ্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিত। বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এইজন্য বলিতেছি, তৎকালে পাঠ্যগ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না। কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সন্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিত, এবং যাহারা সন্তানদিগকে রাজকার্যের জন্য শিক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে পারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী সরকারের কর্ম্ম করিতে বা বিষয়-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাহারাই শেষ পর্যন্ত গুরুমশায়ের পাঠশালাতে থাকিত'।

বলা বাহুল্য, এই শিক্ষার সামান্য সুযোগটুকুও সে যুগে শুধুমাত্র হিন্দু উচ্চবর্ণের সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নিচু বর্ণের সন্তানরা বা সমস্ত জাতের মেয়েরা এই সুযোগটুকুও পেতো না। মুসলমান সমাজের অবস্থাও তথৈবচ। গোটা দেশজুড়েই তখন অশিক্ষার ব্যাপক প্রভাব। সেই সঙ্গে নানা ধরনের কুসংস্কার মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার অন্যতম উদাহরণ সেই সময়কার বহুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা।

রামতনু লাহিড়ীর জন্ম আনুমানিক ইংরেজি ১৮১৪ সালে। তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম আমলের ছাত্র। মফঃস্বলের পাঠশালা শিক্ষা সমাপ্ত করে যে গুটিকয় ছাত্র ওই স্কুলে পৌঁছতে পেরেছিলেন, রামতনু লাহিড়ী তাদের মধ্যে একজন। ওই আমলে হিন্দু স্কুলে মূলতঃ অভিজাত হিন্দু পরিবারের সন্তানরা পড়তো। তাদের শিক্ষিত করে তোলার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, এমন এক শ্রেণী গড়ে তোলা, যারা হবে হাবেভাবে, আদব কায়দায় ইউরোপিয়ান, কিন্তু চেহারা নেটিভের। যাদের সাধারণ মানুষের সাথে কোনো যোগাযোগ থাকবে না, ইংরেজদের পদলেহী হয়ে তারা থাকবে চিরকাল। পাশাপাশি সংস্কৃত কলেজ তৈরি হলো এমন এক পাঠক্রম, যাতে থাকবে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ, সামান্য ইংরেজি ও প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষা।

কিন্তু দৈত্যকুলে যেমন প্রহ্লাদ জন্মায়, তেমনি ব্রিটিশ শাসকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বিশিষ্ট প্রতিভা সেই আমলে শিক্ষার জগতে এসেছিলেন, আর এদের পরিকল্পনা বেশ কিছুটা উল্টে পাল্টে দিতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন লুই ডিরোজিও, আর দ্বিতীয়জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর তাঁদের পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করা যায় রামমোহন রায়কে। স্বল্পায়ু ডিরোজিও খুবই অল্প সময় হিন্দু কলেজ অধ্যাপনা করেছেন। সেই অল্প সময়েই ছাত্রদের কাছে তিনি মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদের আলো পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। একদিকে যেমন তাঁর ছাত্ররা, যারা পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গল বলে পরিচিত হয়েছিল, পাশ্চাত্যের নবজাগরণের সাহিত্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞানের নতুন নতুন মণিরত্নের রসাস্বাদন করতে শিখেছিল, তেমনি সমস্ত কিছুকে প্রশ্ন না করে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু ডিরোজিওর এই স্পর্ধা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে পারেনি। তাঁকে চাকুরী থেকে পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু ডিরোজিওর দেওয়া শিক্ষার ফল হয়ে ওঠে সুদূরপ্রসারী। তার ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিষয়ে এক একটি নক্ষত্র হয়ে ওঠেন।

অপরদিকে বিদ্যাসাগরের পড়াশোনা সংস্কৃত কলেজেই। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠের পাশাপাশি তিনি পেয়েছিলেন সামান্য ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষার আলো। কিন্তু অসম্ভব মেধাবী বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানকার প্রথাগত শিক্ষা শেষ করে ওই সংস্কৃত কলেজেরই শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। তারপর তাঁর প্রতিভার বলে ধীরে ধীরে পদোন্নতি হয়ে ওই কলেজের অধ্যক্ষ, তারপর সমস্ত স্কুলে শিক্ষা বিভাগের নির্দেশক। এই পদে নিযুক্ত হয়েই তাঁর প্রথম কাজ হল গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও। আর এই সাথে স্কুলের পাঠ্যসূচির সংস্কার করা। তিনি বুঝেছিলেন, প্রকৃত শিক্ষার মর্যাদা দিতে গেলে প্রথম প্রয়োজন দেশের সমস্ত এলাকায় শিক্ষার বিস্তার। তাই তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। শুধু তাই নয়, মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনে তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেন। তার জন্য যেমন সহজ ভাষায় সীতার বনবাস, শকুন্তলা ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্যের ভাবানুবাদ করলেন, তেমনি লিখলেন কথামালা , বোধোদয় ইত্যাদি নীতিকথা ও সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের উপরে বই। এই সাথে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে

গিয়ে তিনি জোর দিলেন গণিত ও দর্শন পাঠ্যবিষয়ে ভারতীয় শাস্ত্রের বদলে ইউরোপিয়ান শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে। প্রাচীন বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন পড়ানোর বদলে প্রস্তাব করলেন, পড়ানো হোক গ্যালিলিও, নিউটনের জীবনী ও তাদের নানা আবিষ্কারের সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি। কিন্তু, সনাতনী পন্ডিতরা এতদূর মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজ শাসকরাও দেখলো এটা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

অচিরেই ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মতান্তরের জেরে বিদ্যাসাগর চাকুরী থেকে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু ভীত না হয়ে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি চালানোর জন্য নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে সাহায্য করে গেছেন। সেই সাথে আরো গভীর সমাজ সংস্কারের জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করলেন।

ঠিক একই রকম ভাবে মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলে ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে ইংরেজি শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষার বিস্তারের জন্য পুরুষ ও মেয়েদের পড়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা নিজেরা ছিলেন সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষ।নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তাঁরা নারী শিক্ষা ও নিচু জাতের মানুষের শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল স্থাপন করেন এবং কুসংস্কার ও মনুবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়াই করে যান। একই ভাবে বাংলার বুকে মুসলিম নারীদের শিক্ষাদানের জন্য বেগম রোকেয়া তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন।

আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে উপনিবেশকারী ইংরেজদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তাদের সঙ্গে স্বল্প হলেও আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার আলো কিছুটা পৌঁছেছিল।তারই প্রভাবে বাংলার মাটিতে ইয়ং বেঙ্গল, বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম মতাবলম্বী কিছু মানুষ সীমিত হলেও নবজাগরণের আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন। চিন্তা ভাবনা, মননে তাঁরা হয়ে উঠলেন প্রকৃতই আধুনিক মানুষ। তার প্রভাব সাহিত্য, চিত্রকলা, বিজ্ঞান- সমস্ত এলাকায় ছাড়িয়ে পড়লো। কলকাতা হয়ে উঠল বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। একই সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাথ সাহা, সি ভি রমন , প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ - ইত্যাদি নক্ষত্রের কলকাতার বুকেই উত্থান ও বিকাশ সরকারি অনুগ্রহ ছাড়াই ঘটে যাওয়া নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এর পেছনে কাজ করেছে, যুক্তিশীল চিন্তার বিকাশ, ভাবের আদান প্রদান, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে গ্রহণ করার উদার মানসিকতা, স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করার আভাস ও সেই সাথে এক জাতীয়তাবোধ। (ক্রমশ)

(লেখক আই আই টি-র প্রাক্তণ অধ্যাপক)

আন্তর্জাতিক

এলোমেলো কথা

লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ

শুভ বসু

বিগত ৩ জানুয়ারী , ২০২৬ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ভেনেজুয়েলার উপর সামরিক আক্রমণ চালিয়ে সে দেশের রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে মার্কিন সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে এসেছে।

বর্তমান সহস্রাব্দে মানে ২০০০ সালের পর থেকে , ৭ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে আক্রমণ করে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার প্রতিক্রিয়ায় 'অপারেশন এন্ডুরিং ফ্রিডম' শুরু করে, যার লক্ষ্য ছিল আল-কায়েদাকে ভেঙে ফেলা এবং তাদের আশ্রয়দানকারী তালেবান শাসনকে অপসারণ করা, যার ফলে প্রায় দুই দশকের সামরিক উপস্থিতি শুরু হয়।

এর পরে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে, ১৯ মার্চ, ২০০৩ তারিখে অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম শুরু করে, 'শক ও বিস্ময়' বোমা হামলার মাধ্যমে, এরপর সাদ্দাম হোসেনের শাসনকে উৎখাত করার জন্য স্থল আক্রমণের মাধ্যমে, ইরাক যুদ্ধের সূচনা করে যা ২০১১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর নেতৃত্বে লিবিয়াতে হস্তক্ষেপে অংশগ্রহণ করে, যার ফলে ২০১১ সালের অক্টোবরে লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতন ঘটে এবং মৃত্যু ঘটে। সেই বছরের শুরুতে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার শাসনের অবসান ঘটে।

বিগত ২২ জুন, ২০২৫ তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের অংশ হিসেবে অপারেশন মিডনাইট হ্যামার কোড নামে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনা আক্রমণ করে। ফোর্ডো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র, নাতানজ পারমাণবিক স্থাপনা এবং ইসফাহান পারমাণবিক প্রযুক্তি কেন্দ্রকে চৌদ্দটি GBU-57A/B MOP 'বাঙ্কার বাস্টার' বোমা দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, যা B-২ স্পিরিট স্টিলথ বোমারু বিমান দ্বারা বহন করা হয়েছিল এবং একটি সাবমেরিন থেকে ছোড়া টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রও ছিল। ট্রাম্পের মতে, মার্কিন F-35 এবং F-22 যুদ্ধবিমানও ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে তাদের ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে, কিন্তু কোনও উৎক্ষেপণ সনাক্ত করা যায়নি। এর কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রর সরকার জাতি সংঘের অনুমতি গ্রহণ করেননি। তবে ল্যাটিন আমেরিকার রাজনীতিতে মার্কিন ভূমিকার একটি ইতিহাস রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো ১৮২৩ সালের ২রা ডিসেম্বর কংগ্রেসে তার সপ্তম বার্ষিক স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে প্রথম এই মতবাদটি প্রকাশ করেন (যদিও ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এটি তার নামে নামকরণ করা হয়নি)। সেই সময়ে, আমেরিকার প্রায় সমস্ত স্প্যানিশ উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল অথবা স্বাধীনতার কাছাকাছি ছিল। মনরো জোর দিয়েছিলেন যে নতুন বিশ্ব এবং পুরাতন বিশ্বকে প্রভাবের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে থাকতে হবে,এবং এইভাবে এই অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির আরও প্রচেষ্টা মার্কিন নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হবে। পরিবর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যমান ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিকে স্বীকৃতি দেবে এবং হস্তক্ষেপ করবে না বা ইউরোপীয় দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

ল্যাটিন আমেরিকাতে অবশ্য মনরো ডক্ট্রিন অনেকেই মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ভিত্তি। ("Las venas abiertas de América Latina") উরুগুয়ের সাংবাদিক, লেখক এবং কবি এডুয়ার্ডো গ্যালিয়ানোর লেখা একটি বই, যা ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটিতে ইউরোপীয় বসতি, সাম্রাজ্যবাদ এবং দাসত্বের প্রভাব ল্যাটিন আমেরিকায় কীভাবে পড়েছে তার বিশ্লেষণ রয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল শীতল যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট আদর্শিক বিভাজনের সময়, যখন বেশিরভাগ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-স্পন্সরিত নিষ্ঠুর ডানপন্থী একনায়কতন্ত্র ছিল। বেশ কয়েকটি দেশে 'ওপেন ভেইনস' নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং দ্রুত বামপন্থী চিন্তাবিদদের একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মের জন্য একটি রেফারেন্স হয়ে ওঠে। বইটি অবশ্যপাঠ্য যাঁরা ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে জানতে চান।

ল্যাটিন আমেরিকান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ১৯৫০ এর দশকে কিউবা তে ২৬ শে জুলাই আন্দোলনের পরিপেক্ষিতে একটি আন্দোলন তৈরী হয় যার মধ্যে কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিণত হয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। তার ফলে হয় বে অফ পিগস ইনভেসন (স্প্যানিশ Invasión de la Bahía de los Cochinos– যাকে কখনও কখনও Invasión de Playa Girón îy Batalla de Playa Girón নামেও ডাকা হয়) ছিল ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কিউবার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবান ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনারি ফ্রন্ট (DRF) কর্তৃক পরিচালিত একটি ব্যর্থ সামরিক অবতরণ অভিযান। এই অভিযানে কিউবান নির্বাসিতরা অংশ নিয়েছিলেন যারা ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবান বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিলেন, গোপনে এবং সরাসরি মার্কিন সরকার অর্থায়ন করেছিল। এই অভিযানটি শীতল যুদ্ধের তুঙ্গে থাকাকালীন হয়েছিল এবং এর ব্যর্থতা কিউবা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে শুরু হয় কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস। তার কিছু পরেই চে গুয়েভারা বিপ্লবের আগুন জ্বালানোর জন্য একটি ব্যর্থ গেরিলা অভিযানের পর বলিভিয়ার লা হিগুয়েরায় সিআইএ-এর সহায়তায় বলিভিয়ার সৈন্যদের হাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, যার ফলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সংক্ষিপ্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, পরে তার দেহাবশেষ পাওয়া যায় এবং সমাধিস্থ করার জন্য কিউবায় ফিরিয়ে আনা হয়, যা একজন বিপ্লবী আইকন হিসেবে তার ভাবমূর্তিকে দৃঢ় করে তোলে। লাটিন আমেরিকাতে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন থেমে থাকেনি।

সালভাদোর গুইলারমো অ্যালেন্ডে গোসেন্স [এ] (২৬ জুন ১৯০৮- ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) ছিলেন একজন চিলির সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ যিনি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত চিলির ২৯তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন সমাজতান্ত্রিক হিসেবে, তাকে ল্যাটিন আমেরিকার উদার গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রথম মার্কসবাদী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে সরানোর জন্যে যে সামরিক অভ্যুত্থানে হয় তাতে সিআইএ' র হস্তক্ষেপ ছিল। সালভাদোরান গৃহযুদ্ধ (স্প্যানিশ guerra civil de El Salvador) ছিল এল সালভাদোরে বারো বছরের গৃহযুদ্ধ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত এল সালভাদোর সরকার [২৪] এবং ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবা সমর্থিত বামপন্থী গেরিলা গোষ্ঠী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জোট ফারাবুন্দ মাল্টি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (FMLN) এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৭৯ সালের ১৫ অক্টোবর একটি অভ্যুত্থান এবং এরপর অভ্যুত্থান-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সরকারিভাবে হত্যাকে গৃহযুদ্ধের সূচনা হিসেবে ব্যাপকভাবে দেখা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, ১৯৯২ সালের ১৬ জানুয়ারী মেক্সিকো সিটিতে চ্যাপুলটেপেক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যুদ্ধটি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়নি। সে সময় স্যান্ডিনিস্তা বিপ্লব (১৯৭৯-১৯৯০) ছিল স্যান্ডিনিস্তা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট SFSLNV এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি আন্দোলন যা নিকারাগুয়ায় মার্কিন-সমর্থিত আনাস্তাসিও সোমোজা ডেবেলের একনায়কতন্ত্রকে উৎখাত করে, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাক্ষরতা, ভূমি সংস্কার এবং জাতীয়করণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে

একটি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং মার্কিন-সমর্থিত কন্ট্রা যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো শ্যাভেজের নেতৃত্বে বলিভারিয়ান বিপ্লব (১৯৯৯-২০১৩), ছিল সিমন বলিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য ছিল ল্যাটিন আমেরিকার ঐক্য, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে) এবং তেল রাজস্বের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ, একটি নতুন সংবিধান প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, একই সাথে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বামপন্থী সরকারগুলির একটি ''গোলাপী জোয়ার'' গড়ে তোলা। এটি শুরু হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে শ্যাভেজের বিপ্লবী বলিভারিয়ান আন্দোলন-২০০ (এমবিআর-২০০) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ১৯৯২ সালের একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে তার সমাপ্তি ঘটে, যা ভেনেজুয়েলার রাজনীতিকে রূপান্তরিত করে।

বর্তমান সামরিক অভিযান হলো বিপ্লবী বলিভারিয়ান আন্দোলন-২০০'এর বিরুদ্ধে অভিযান। তার উপরে ভেনেজুয়েলা হলো তেলের ভান্ডার। OPEC– ২০১৩ অনুসারে বিশ্ব তেল মজুদের একটি মানচিত্র ১ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত ভেনেজুয়েলায় প্রমাণিত তেল মজুদ বিশ্বের বৃহত্তম হিসাবে স্বীকৃত, মোট ৩০০ বিলিয়ন ব্যারেল (৪.৮×১০১০ m৩)। বিপি স্ট্যাটিস্টিকাল রিভিউ অফ ওয়ার্ল্ড এনার্জির ২০১৯ সংস্করণে ভেনেজুয়েলার মোট প্রমাণিত মজুদ ৩০৩. ৩ বিলিয়ন ব্যারেল (সৌদি আরবের ২৯৭.৭ বিলিয়ন ব্যারেলের চেয়ে সামান্য বেশি) রিপোর্ট করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি এখন মনরো ডক্ট্রিন এর অনুরূপ Donro ডক্ট্রিন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে এই ধরণের ঘটনা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই অনুমার করা হয়। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করলাম। আপনারা পুরো হিসেবে মিলিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছবিটা দেখতে পাবেন।

(লেখক ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

আন্তর্জাতিক আইনকে তোয়াক্কা না করে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে অপহরন করালো ডোনাল্ড ট্রাম্প

সৌর বসু

বিগত শনিবার ৩ জানুয়ারি কোন উস্কানি ছাড়াই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনিজুয়েলা আক্রমণ করে এবং ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং জাতীয় পরিষদের ডেপুটি সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসে। এদের অপহরণ করার জন্য মার্কিন সামরিক বাহিনী কারাকাসের উপর বোমা বর্ষণ করে, হামলা চালায়, বেশ কিছু মানুষকে হত্যা করে। মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ,যা এখনো প্রমাণিত নয় । ৫ জানুয়ারি এদের ম্যা। নহাটনে ফেডারাল আদালতে হাজির করা হয়। মাদুরোকে অপহরণের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন নির্মমভাবে লংঘন করে। জাতিসংঘের সনদে উল্লেখ আছে যে কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত বিষয়ে কোনোভাবেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করেনা। বস্তুতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি ১৯৪৭ সালের পর থেকেই আইন বহির্ভূতভাবে বল প্রয়োগ করে রাজনৈতিক কূটকৌশল এবং গোপন পদক্ষেপ, অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্য দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে । ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৯ এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ৭০ টি এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় Linsey A Rourke রচিত regime change বইটির মধ্যে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এর পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে ইরাক , লিবিয়া, হন্ডুরাস , ইউক্রেন এবং ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশগুলিতে। ভেনিজুয়ালাতে ২০০২ সাল থেকে আমেরিকা চোরাগোপ্তা অভিযানের মাধ্যমে ভেনিজুয়েলার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলাতে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুগো সাভেজকে স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে অভ্যুত্থান সংঘঠিত করার ব্যাপারে মার্কিন দেশের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তেল কোম্পানির রাষ্ট্রীয়করনের ফলে, আমেরিকার তেল কোম্পানি গুলির আয় কমে যায়। একশন মোবিল , conoco philips প্রভৃতি কোম্পানিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাভেজের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারাক অবামা, বুশ এবং বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে তেলসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২০১৯ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানির উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। উদ্দেশ্য ছিল নিকোলাস মাদুরো কে ক্ষমতাচ্যুত করা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের ফলে ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানির ব্যাপক ক্ষতি হয়

এবং দেশের অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন প্রত্যহ ১.৫ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে ৩৩৭০০০ ব্যারেল এ নেমে আসে। তেল থেকে আয় ব্যাপক হারে কমে যায়।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি স্প্যানিশ আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে স্বাধীনতা পাবার সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ,ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে । আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল ল্যাটিন আমেরিকার ব্যাপক খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা। ১৮২৩ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে ইউরোপীয় আধিপত্যবাদীদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবে ,বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলাবে না।এটা ছিল আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো ঘোষিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি।

ল্যাটিন আমেরিকা তখন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃগয়া ভূমি। বিংশ শতাব্দীতে ল্যাটিন আমেরিকার চিলি, নিকারাগুয়া ,বলিভিয়া, মেক্সিকো, কিউবা প্রভৃতি সমস্ত দেশে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা চালিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে পশ্চিম গোলার্ধের একচ্ছত্র অধিপতি তারা। উন্মাদগ্রস্ত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় ক্ষমতায় আসার পর এই অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিকারাগুয়ার উপর বোমা বর্ষণ করেছে, ইরান তার নির্দেশ মতো না চললে ইরানকে আক্রমণ করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। ইউরোপের গ্রিনল্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে হুঁশিয়ারি জারি করেছে। আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে, জাতিসংঘের সনদকে অবজ্ঞা করে ট্রাম্প যেভাবে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করেছেন, এটা ট্রাম্প - এর ক্ষমতা প্রদর্শনের নির্লজ্জতম নিদর্শন। ভেনেজুয়েলার এই কাণ্ডে সমগ্র ইউরোপ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। আমেরিকার সংবাদপত্রে (নিউ ইয়র্ক টাইমস ,ওয়াশিংটন পোস্ট প্রমুখ) কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নি। অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও ,আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে মাদুরোকে অপহরণের ঘটনা বিশেষ বিচলিত করতে পারেনি। এ এক আশ্চর্য পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। যেখানে ইসরাইল পশ্চিম এশিয়ায় ফিনিস্তিনিওদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে ,গণহত্যা সংঘটিত করছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক আদালত ইসরাইলকে অপরাধী ঘোষণা করার পরেও ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। দেখে শুনে মনে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইনের ঊর্ধ্বে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনিজুয়েলায় সৈন্য পাঠিয়ে মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করেছে , আমেরিকার কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়ে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার কে অন্ধকারে রেখে ডোনাল্ড ট্রাম্প অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। অপরদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছেন, সেই দেশে গণতন্ত্র সুরক্ষিত নয় এই অভিযোগে। অথচ নিজের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে।বোধ করি আমেরিকায় এখন উত্তর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিরাজ করছে। মার্কিন নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার আজ উপেক্ষিত। মার্কিন নাগরিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের উপর বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে, হিংসাত্মক আক্রমণ করা হচ্ছে। যুদ্ধে আক্রান্ত দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি মার্কিন নাগরিকরা নিহত হচ্ছেন। রাষ্ট্রের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

রাশিয়া চীন মেক্সিকো প্রমূখ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আমেরিকার অপহরণ কাণ্ডের কড়া সমালোচনা করেছে।

ভেনেজুয়েলা পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জেফরি স্যক্স বলেন যে অন্য দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য বল প্রয়োগ, গোপন অভিযান এবং রাজনৈতিক কারসাজি ব্যবহারের একটি নথিভুক্ত ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। তিনি জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন পারমাণবিক যুগে যুদ্ধের ট্রাজেডি প্রতিরোধ করার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সতর্ক করে দেন এই বলে যে এখন জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আইন বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে তা মানবজাতির বিলুপ্তির কারণ হতে পারে।

ইরানের মানুষ এখন কঠিনতম লড়াই-এর মুখোমুখি

মনিরুল হক

এই মুহূর্তে সমগ্র ইরান একটি সুবিশাল অগ্নিস্তুপ। বুলেট, বোমা আর বাকযুদ্ধে ক্রমগত ছিন্নভিন্ন হয়ে চলেছে দেশটি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছেন দুই পক্ষ। একদিকে তার সমস্ত অপনীতি- অপকর্ম নিয়ে কট্টর ইসলামতান্ত্রিক খোমেনি সরকার এবং অপরদিকে সে দেশের

অত্যাচারীত, গণতন্ত্রকামী অদম্য জনশক্তি। তৃতীয় পক্ষের অবির্ভাবও হয়েছে তড়িৎ গতিতে। মহামতি ট্রাম্প এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা লকলকে জিহ্বা নিয়ে ইরানের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হায়নার মতো। তাঁরা অযথাই গণতন্ত্রকামী মানুষের বন্ধু সাজার অভিনয় করছেন। কিন্তু তাঁরা তো কখনই এই হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করে নেওয়া খোমেনির শাষন থেকে মুক্তিপ্রত্যাশী সাধারণ মানুষের বন্ধু হতে পারেন না কারণ পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে তাঁরাই এইসব মারণযজ্ঞের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতদাতা। তবে ট্রাম্প সাহেব যেটা পারেন সেটা হল, আনুগত্যের বিনিময়ে এই অত্যাচারী খোমেনি শাসনকে নতুন করে বৈধতা দেওয়া অথবা কোন পুতুলকে নতুন করে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া অথবা ইরানকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দেশটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া। তাই ইরানের মানুষের সামনে এখন কঠিন পরীক্ষা। আমরা আশা করব, লড়াই কঠিন হলেও, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে প্রতিহত করে তাঁরা দেশ থেকে ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হবেন।

শত শত বছর ধরে ইরানে চলেছে রাজতন্ত্র আর শেষের দিকে এই ১৯৭৯ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত চলছে কট্টর শিয়া মতবাদের ধারক খোমেনিদের ইসলামতন্ত্র। আধুনিক রাজনীতির প্রাণভোমরা গণতন্ত্রের ছিটে-ফোঁটাও খোমেনিদের এই ইসলামতন্ত্রে কেউ খুঁজে পাবেন না। তবে ইরানের মানুষ যে কখনও গনতন্ত্রের স্বাদ পান নি তা নয়। সেই ১৯০৭ সালে অনেক টালবাহানা পর তখনকার শাসক 'কাজার' (১৯৭৯ সালে আঘা মহম্মদ খান কাজার প্রতিষ্ঠিত) পরিবার জাতীয় পার্লামেন্ট 'মজলিশ' গঠনে সম্মত হয়। কিন্তু বাস্তবে সেই মজলিশের ক্ষমতা ছিল সীমিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন সব দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন তখন ১৯৪৯ সালে এক অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মহম্মদ মোসাদ্দেক National Front নামে এক মধ্য-বামপন্থী দল গঠন করেন এবং ভোটে জিতে তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে অসীন থাকেন। এ সময়ে তিনি বহু জনমুখী প্রকল্প রূপায়িত করেন। তবে তাঁর যুগান্তকারী কাজ ছিল Anglo-Persian Oil Company জাতীয়করণ করা। আর এই জাতীয়করণের কারণেই তিনি পদচ্যুত হন ইঙ্গ-আমেরিকান চক্রান্তে। মহম্মদ মোসাদ্দেকের পতনে ইরানে গনতন্ত্রেরও পতন হয়। 'শাহ'দের হাতে ক্ষমতা আবারও কেন্দ্রীভূত হয়।

ইরানের শাহ'রা ছিলেন পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসারী। তাঁরা ইসলামী 'তরীকা' অনুসরনের পরিবর্তে আধুনিক ভাবেই জীবন কাটাতেন এবং ইরানের সাধারণ মানুষও খোলা হাওয়ায় জীবন যাপন করতেন। ১৯৬৩ সালে রেজা শাহ পহলবি কিছু সংস্কার কর্মসূচিও গ্রহন করেন। ভূমি সংস্কার, বনভূমি জাতীয়করণ, মুনাফায় শ্রমিকদের ভাগ, শিক্ষার প্রসার, মহিলাদের ভোটাধিকার এবং সরকারী চাকুরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং অন্যান্য অধিকার যা এক উন্নত সমাজব্যবস্থার দিকে দেশকে নিয়ে যাবে বলে তিনি মনে করতেন। তবে তাঁর এই কর্মসূচী যা 'শ্বেত বিপ্লব' বলে পরিচিত, শিয়া 'আলেম' সমাজের থেকে তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। এই বিরোধিতার সূত্র ধরেই আয়াতোল্লা রুহল্লা খোমেনির উত্থান হয়। যাঁরা পশ্চিমা কিংবা আধুনিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকে বিজাতীয় এবং বিধর্মী মনে করেন তাঁদের নেতা হয়ে উঠলেন খোমেনি। সে সময়ে খোমেনি যে কথাগুলি বলতেন তা সংক্ষেপে এই রকম -'আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে সরকারের মন্দ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তারা ইসলামের অধ্যাদেশকে বিরোধীতা করে।... বিচার মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামের অধ্যাদেশের বিরোধীতা স্পষ্ট করেছে, যেমন বিচারকদের মুসলিম ও পুরুষ হওয়া প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা; এখন থেকে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা মুসলমানদের সম্মান ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলি সিদ্ধান্ত নেবে।'

১৯৭৯ সালে ইরনে যে শাহ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তার মূল কারনগুলি ছিল সামগ্রিক অর্থনৈতিক দুর্নীতি, বেকারি, মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, শাহ পরিবার এবং আরও কিছু মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে সম্পদের জমে ওঠা পাহাড়, উপরতলার মানুষের চরম বিলাসী জীবন যাপন, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, গনতন্ত্রহীনতা এবং যে কোনও ধরনের প্রতিবাদ ও আন্দোলনে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর অত্যাচার। ফলে স্বাভাবিক কারণেই শাহ বিরোধী আন্দোলন জনআন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু আন্দোলন সফল হওয়ার পর যে সরকার গঠিত হয়, তাঁরা আন্দোলনের বাকি সব দাবিকে তুচ্ছ করে 'ইসলামী শরিয়তি আইন, ইসলামি সংস্কৃতি' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে শুরু করে। তাই সেই আন্দোলন আজ 'ইরানের ইসলামিক বিপ্লব' বলেই সবার কাছে পরিচিত।

সেই ১৯৭৯ সাল থেকে 'ইসলামিক বিপ্লব' সফল করার জন্য ইরানের সরকার অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং এই বিষয়ে 'সাফল্যের' কারণেই ২০২২ সালে সে দেশের মহিলারা এক ব্যাপক হিজাব বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক কুর্দ তরুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সঠিকভাবে হিজাব পরেন নি আর তাই তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশ মেরে ফেলে। এই ধর্মবাদী নৃশংসতার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মহিলা কয়েক মাস ধরে স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনে অংশ নেন এবং অন্ততঃ ৫০০ মহিলা মাশা আমিনির সঙ্গে

সহমরণ বরণ করেন। কিন্তু তাতেও ধর্মীয় শাসনে কোন শিথিলতা আসে নি বরং শাষকের ঔদ্ধত্য আরও বেড়েছে। ইরান সরকার কোনও অবস্থাতেই, কাউকেই তাদের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনকে রেয়াত করবে না। ইসলামের নামে অধিষ্ঠিত এই খোমেনিতন্ত্র বর্তমান সময়ে স্বৈরাচারী শাষকগোষ্ঠী হিসাবে সম্ভবতঃ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে।

সেই শাহদের আমল থেকেই অভিজাত এবং ব্যবসায়ীরা সর্বদা শাষকের পক্ষেই আবস্থান করছেন। খোমেনি শাসনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তেহরানের ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট প্রভাবশালী। তাঁরা হঠাৎ করেই খোমেনি বিরোধী হয়ে ওঠেন নি। কেনা-বেচা নেই, লেনদেন নেই; মানুষের হাতে পয়সা নেই অথচ ইরানি মুদ্রার অবনমন হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। শুনলে অবাক হতে হয়, ইরানের প্রবৃদ্ধির গড় হার ০.৬% আসলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা আজ ইসলামিক স্বৈরতন্ত্রপ্রেমী ব্যবসায়ীদের ঘরেও জাঁকিয়ে বসেছে। আর তাই তাঁরা ব্যবসাপত্র বন্ধ করে হরতালের ডাক দিয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের হরতাল-আন্দোলন, সরকার বিরোধী স্লোগান উচ্চারণ, খোমেনির অপসারণ দাবি দেশব্যাপী আলোড়ন তুলেছে। সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। আন্দোলনকারীদের শুধু দেশের নয়, ইসলামের শত্রু হিসাবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আল্লাহ'র বিরুদ্ধে আন্দোলন। অতএব চুড়ান্ত শাস্তি অনিবার্য। মহান আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে খোমেনি সাহেব শুধুমাত্র সেই শাস্তি কার্যকর করবেন। করছেনও। বিরোধীদের নিকেশ করার এমন অজুহাত আর 'কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' এবারেও কোতলের সংখ্যাটাও হাজারেই হবে; তা ২, ৪ বা ১০+, কিছু একটা হতে পারে। অন্য কিছু না হোক, ইসলামের নামে সুন্দরভাবে মানুষ খুন করার জন্য খোমেনিরা বিখ্যাত হয়ে থাকবেন। ১৯৮৮ সালে এক ঝটকায় জেলে বন্দী বহু মানুষকে তাঁরা খুন করেন। খুনের সংখ্যা নিয়ে রাষ্ট্রপতি রফসানজানি বলেছিলেন ১০০০ জন। তখনকার খোমেনির ডেপুটি হোসেন-আলি-মন্তাজেরি সংখ্যাটা বলেছিলেন ৩৮০০ আর '৭৮-৭৯ সালের আন্দোলনে তাঁদের অন্যতম সহযোগী দল পিপলস্ মুজাহেদি অফ্ ইরানের তরফে বলা হয়েছিল, সংখ্যাটা হবে ৩০০০০। আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, গত প্রায় ৫০ বছরে জেলে এবং জেলের বাইরে ইসলামকে রক্ষা এবং ন্যায় বিচারের নামে কতো মানুষের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছেন খোমেনিরা।

বহু বছর ধরে ইরান আমেরিকা ও তার সহযোগী ইউরোপের দেশগুলির অবরোধের মুখেই পড়ে আছে। আর এখন, এই রকম অনুকূল আবহাওয়া কাজে লাগানোর জন্য তো ট্রাম্প সাহেব ওৎ পেতেই থাকেন। কাঁটা-চামচ ফেলে দু-হাত দিয়ে মেখে-জুখে খাওয়ার জন্য নগ্ন হয়ে নেমে পড়েছেন আগ্রাসী ভূমিকায়। কখনও ইরান আক্রমণের হুমকি দিচ্ছেন, কখনও তাঁর দূত স্টিভ উইটকফ-কে দূতিয়ালি করতে বলছেন আবার কখনও ইরানের সহযোগী সব দেশের উপর ২৫% শুল্ক চাপানোর হুঙ্কার দিচ্ছেন। সোজা কথা, ইরানের উপর পূর্ণ কতৃত্ব তাঁর চাই। বাগাড়াম্বরে পিছিয়ে নেই ইরানের কতৃপক্ষও। তাঁরা কখনও তাঁদের আকাশসীমা বন্ধ করছেন, কখনও খুলছেন। তাঁরাও নাকি যুদ্ধ জয়ের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরঘাচি পালা করে যুদ্ধবানী শোনাচ্ছেন। কখনও ইজরায়েল, কখনও আমেরিকার সহযোগী সৌদি আরব, বাহারিন, কুয়েত বা কাতারকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করলে তার ফল তাদের ভুগতে হবে। যেন যুদ্ধ হলে দু'পক্ষই জিতবেন!

একথা আমরা জানি যে,আজকের ইরান যা আগে পারস্য নামে খ্যাত ছিল, তার সভ্যতা বহু পুরানো। পুরানো অনেক সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনোটি বা কালের করাল গ্রাসে, কোনটি বা উন্নততর কোন সভ্যতার সমূল আত্মসাৎ এর ফলে। কিন্তু রূপ পাল্টালেও পারস্য সভ্যতার ঐতিহ্য কখনও মলিন হয়নি। ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা সেই কথাই বলে। তুলনা বা প্রতিতুলনা সবসময় সত্য কথা বলে না তবুও ঐতিহ্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনুমান করার জন্য একটা পরিসংখ্যান এখানে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। মিশরের মতো দেশ, যেখানে UNESCO World Heritage Site এর তকমা পেয়েছে ৭ টি স্থাপনা, সেখানে ইরানে এই সংখ্যা ২৯ টা। আরবের ইসলাম পারস্যকে যা দিয়েছে, নিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি। আজও শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিত্ত-চেতনায় অন্য বহু দেশ বা জাতি থেকে তাঁরা অনেক এগিয়ে আছেন। সেই ইরানের আধুনিক মানুষকে ধর্মতন্ত্রে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা যে একদিন বিফল হবে তা জোর দিয়েই বলা যায়। বিগত এক-দেড়'শ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁরা বিদেশি শাসন, 'কাজার' অথবা 'শাহ' পরিবারের শাসন অথবা খোমেনিদের শাসনের মধ্যে বাস করেও নিজেদের সমুন্নত রাখতে পেরেছেন। তাঁরা ভালো করেই জানেন; রাজতন্ত্র নয়, ইসলামতন্ত্র নয়, ট্রাম্পতন্ত্র নয়, ইরানের প্রয়োজন আধুনিক, প্রকৃত গনতন্ত্রসম্মত একটি রাষ্ট্র। তার জন্য লড়তে হবে এবং সে লড়াই তাঁরা জারি রাখবেন।

মার্কিনি শুল্ক আরোপের হুমকির কাছে বিশ্বগুরুর অসহায়তা ক্রমশ বাড়ছে

অমিত দাশগুপ্ত

অতি সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সে দেশের দ্বিদলীয় 'স্যাংসনিং রাশিয়া আইন', যা গ্রাহাম-ব্লুমেনথাল বিল হিসেবে সমধিক পরিচিত সেটিতে সহমত পোষণ করেছেন। গত বছরের পয়লা এপ্রিল এই বিলটি সেনেটে পেশ করা হয়, রিপাবলিকান সেনেটর গ্রাহাম এবং ডেমোক্রাট সেনেটর ব্লুমেনথাল এই বিলের প্রণেতা। যেহেতু ৮৪ জন সেনেটর, অর্থাৎ মার্কিন সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আইন প্রণেতা ওই বিলটিকে একযোগে পেশ করতে সম্মত হয়েছেন, তাই নিয়মানুসারে রাষ্ট্রপতি তাতে ভেটো দিতে পারবেন না। ওদিকে ট্রাম্প সাহেব রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুটিনকে ইউক্রেনের উপর আক্রমণ বন্ধ করানোর জন্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজি করাতে চেয়েছিলেন বলে ওই আইনে সম্মতি দিতে টালবাহানা করছিলেন।

২০২৬-এর গোড়ায় তিনি সেটিতে রাজি হন। ওই আইন অনুসারে যে দেশগুলি জেনেবুঝে রাশিয়া থেকে জ্বালানী, গ্যাস বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসামগ্রী (যেমন ইউরেনিয়াম) আমদানি করবে তাদের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর উপরে ন্যূনতম ৫০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যদিও ওই আইনে ৫০০ শতাংশ ন্যূনতম শুল্কের কথা বলা হয়েছে তবুও জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলে চূড়ান্ত স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বিবেচনা করার এবং একবার ১৮০ দিনের ছাড় দেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিলের প্রণেতা চিন, ভারত এবং ব্রাজিলকে আইনটির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতদানের পরে সম্ভবত চলতি (১২-১৮ জানুয়ারি) সপ্তাহেই সেনেটে চূড়ান্ত করা হবে আইনটিকে।

লক্ষ্যণীয় যে, গত ৭ জানুয়ারি ওই স্যাংশনিং রাশিয়া আইনে ট্রাম্পবাবু মত দেওয়ার আগেই গত বছরের আগস্ট মাস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী রফতানির উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকা, যার মধ্যে ২৫ শতাংশ রাশিয়া থেকে জ্বালানী তেল ভারত আমদানি করছে বলে শাস্তি হিসেবে আরোপ করা হয়েছে। আমেরিকা নিজেদের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও ওষুধপত্তরের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেনি। আমাদের দেশ আমেরিকার আরোপ করা শুল্ক বৃদ্ধির পরেও কোনো রকম প্রত্যাঘাত করেনি। স্বঘোষিত বিশ্বগুরু 'প্লিজ স্যর' বলে অনুনয় বিনয় করেছেন বলে ট্রাম্প সাহেব জানিয়েছেন। ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ক্রমাগত কমিয়েছে বলেই পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গত ১৩ জানুয়ারি ট্রাম্প সাহেব ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলির উপরে অতিরিক্ত শাস্তিমূলক ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন। তেমনটা করা হলে স্যাংশনিং রাশিয়া আইনের শুল্ক ব্যতিরেকেই ভারতের বহু দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর উপরে শুল্কহার ৭৫ শতাংশে পৌঁছবে।

এইভাবে যদি ক্রমাগত শুল্কহার বাড়তে থাকে তাহলে ভারত থেকে আমেরিকায় রফতানি ধাক্কা খেতে থাকবে। গত মে মাস থেকে নভেম্বরের মধ্যেই তা ২১শতাংশ কমেছে। যেহেতু, ওই হ্রাসপ্রাপ্ত রফতানির অধিকাংশই শ্রমনিবিড় যেমন বস্ত্র ও চামড়াজাত পণ্য বা গহনা, তাই তা দেশীয় শ্রমের বাজারকেও ধাক্কা দিচ্ছে।

যদি শুল্কের হার বেড়ে সত্যিই ৫০০শতাংশ হয় তাহলে আমেরিকায় কোনো রফতানিই অবশিষ্ট থাকবে না। ভারত ৮৫০০ কোটি ডলারের উপর পণ্য আমেরিকায় রফতানি করে। যদি শুল্কের হার বেড়ে সেই রফতানিকেই ধ্বংস করে দেয় তাহলে অর্থনীতিতে তা যথেষ্টই ধাক্কা দেবে। বিদেশি মুদ্রার ক্ষেত্রে ফল তার ভয়াবহ হতে পারে। এমনিতেই টাকার তুলনায় ডলারের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। তা প্রায় ৯০ টাকা প্রতি ডলার। শুল্ক চাপানোর ফলে রফতানি মার খেলে টাকার দাম আরো কমবে তা বলাই বাহুল্য। মার্কিন শুল্ক চাপের ফলে ইরানের সঙ্গে ভারত যদি বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় তাতে ভারতীয় বাণিজ্যের তেমন কিছু যাবে আসবে না। কারণ সেখানে রফতানির পরিমাণ ১২৫ কোটি ডলার ও আমদানি ১০৬ কোটি ডলার। তবে বাসমতি চালের রফতানি (ভারত থেকে ইরানের অধিকাংশ আমদানি এই খাতে হয়) কমার ফলে সেই চাল উৎপাদককরা মার খাবে, অপরদিকে জৈব রাসায়নিকের আমদানি (ভারত থেকে ইরানের অধিকাংশ রফতানি এই খাতে হয়) প্রভাবিত হবে।

তবে যে বিষয়টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল চাবাহার বন্দর প্রকল্পের উপর এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব। ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ওই বন্দরের উপরে নিষেধাজ্ঞায় ছাড় আছে। তারপরেও যদি ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা চলতে থাকে তাহলে ভারতের ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রটি যথেষ্ট নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হবে। কিন্তু স্যাংসনিং রাশিয়া আইনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারত যদি রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল আমদানি বন্ধ করে দেয় তাহলে ভারতের আমদানি খরচ ১০০০ বিলিয়ন ডলার বাড়বে, যা ভারতের জিডিপির প্রায় ০.৩-০.৪ শতাংশ ফলে সেক্ষেত্রেও বিদেশি মুদ্রার উপরে চাপ বাড়বে। এগুলো সব কিন্তু

আর্থিক ভাবে পরিমাপযোগ্য ফলাফল। কিন্তু যদি মার্কিন চাপের কাছে ভারত মাথা নত করে নেয়; যেটা ভবিতব্য বলেই মনে হচ্ছে, তাহলে তা যেমন একদিকে বিশ্বগুরুর অবস্থাকে বিপর্যস্ত করবে অপরদিকে ভবিষ্যতে মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকারকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে। এই যে মার্কিন শুল্ক চাপের কাছে নতি স্বীকার, তা আদতে নয়া উদারনীতি গ্রহণ ও তদ্‌জনিত বিশ্বব্যাঙ্ক ও আইএমএফের কাছে নতি স্বীকার করে কাঠামোগত সংস্কার, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির বিরাষ্ট্রীয়করণ, বেসরকারি ও বিদেশি পুঁজির উপরে নির্ভরশীলতা এগুলির ফল। এদিক দিয়ে, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদের জুড়লেও, চিন ব্যতিক্রমী।

তাই, মার্কিন শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার সাম্প্রতিক চাপ ভারতের সামনে একটি তাৎক্ষণিক বাণিজ্য সংকটের চেয়েও গভীর প্রশ্ন তুলে ধরেছে। প্রশ্নটি কেবল রাশিয়া বা ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য বজায় রাখা উচিত কি না; তা নয়। আসল প্রশ্ন হলো, কেন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েও ভারত আজ দর কষাকষিতে তুলনামূলকভাবে দুর্বল, আর কেন একই পরিস্থিতিতে চিন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী অবস্থানে থাকতে পারে।

এর উত্তর লুকিয়ে আছে দুই দেশের বিশ্ববাজারে সংযুক্ত হওয়ার পদ্ধতিতে। চিন ধাপে ধাপে ও পরিকল্পিতভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রনির্ধারিত শর্তে। বিদেশি পুঁজি প্রবেশ করেছে ঠিকই, কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থা, কৌশলগত শিল্প ও উৎপাদন শৃঙ্খলের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অটুট থেকেছে। বিশ্ববাজার সেখানে একটি উপায়;কোনো শর্ত নয়। ফলে আজ শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞা চিনের জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলেও তা অর্থনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে ওঠে না।

ভারতের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সংকট ভারতকে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার দ্বারস্থ হতে বাধ্য করে। সেই সহায়তার সঙ্গে যুক্ত ছিল কাঠামোগত সংস্কারের শর্ত; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিরাষ্ট্রীকরণ, বাজার উন্মুক্তকরণ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ এবং বেসরকারি উদ্যোগকে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আমদানি প্রতিস্থাপনের পথ ছেড়ে ভারত রফতানি-নির্ভর প্রবৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়।

এই নীতিগত রূপান্তর প্রবৃদ্ধি এনেছে, কিন্তু একই সঙ্গে তৈরি করেছে গভীর নির্ভরতা। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ বাজারে প্রবেশাধিকার আজ ভারতের শিল্প, কর্মসংস্থান ও সামষ্টিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফলে শুল্ক বৃদ্ধি বা নিষেধাজ্ঞা আর কেবল কূটনৈতিক বক্তব্য নয়; তা হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক আঘাত।

এই নির্ভরতাই নিষেধাজ্ঞাকে কার্যকর করে তোলে। উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থায় বাজারে প্রবেশাধিকার একটি শক্তিশালী অস্ত্র। যে দেশ সেই প্রবেশাধিকারের ওপর বেশি নির্ভরশীল, তার দর কষাকষির ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কমে যায়। ভারতের বর্তমান অবস্থান সেই বাস্তবতাই প্রতিফলিত করছে।

রাশিয়া ও ইরান থেকে আমদানি বন্ধ করা বনাম মার্কিন বাজারে রফতানি হারানোর তুলনায় ভারতের সামনে একটি কঠিন হিসাব দাঁড়িয়ে আছে। জ্বালানি আমদানি ব্যয় বাড়লে চাপ হবে ধীরে ও বিস্তৃতভাবে; কিন্তু রফতানি ধসে পড়লে আঘাত হবে তাৎক্ষণিক ও শ্রমনির্ভর খাতে কেন্দ্রীভূত। এই বাস্তবতার কারণেই ভারত হঠাৎ সংঘর্ষের পথ না নিয়ে ধাপে ধাপে সমন্বয়ের দিকে ঝুঁকছে।

তবে এই বাস্তববাদই আবার ভারতের দর কষাকষির সীমাবদ্ধতাকেও উন্মোচিত করে। চিনের অবস্থান এখানেই ভিন্ন। তার রফতানি বহুমুখী, ঘরোয়া বাজার বিশাল, এবং রাষ্ট্র কৌশলগত খাতে শেষ আশ্রয়দাতা হিসেবে উপস্থিত। ফলে শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞার মুখে সে প্রতিরোধ গড়তে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে সেই বাফার এখনও যথেষ্ট শক্ত নয়।

এই সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। সমস্যা শর্তাধীন অর্থনীতিতে। যখন একটি দেশ সংকটের চাপে আত্মসমর্পণ করে বিশ্ববাজারে যুক্ত হয় এবং সেই সংযুক্ততার শর্ত নিজের হাতে থাকে না, তখন প্রবৃদ্ধি এলেও স্বয়ম্ভরতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এর সমাধান হলো সংযুক্ততার শর্ত নতুন করেসংজ্ঞায়িত করা; রফতানি থাকবে, কিন্তু একমুখী নির্ভরতা নয়; রাষ্ট্র কৌশলগত খাত থেকে সরে যাবে না; বিশ্ববাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, কিন্তু দর কষাকষির শক্ত ভিত গড়ে তুলে।

শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার এই যুগে প্রকৃত শক্তি আসে উৎপাদন সক্ষমতা ও নীতিগত স্বাধীনতা থেকে। যে দেশ নিজের শর্তে বিশ্ববাজারে যুক্ত হতে পারে, সে চাপ মোকাবিলা করতে পারে। ভারতের শাসকদের সে ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। সেই দৃঢ়তাও নেই যে দাঁতে দাঁত চেপে মার্কিন শুল্ক হুমকির মোকাবিলা করবে, শ্রমিক কৃষকের উপরে ভরসা করে; কারণ, বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাই তাদের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সংবিধান ও কারাগারে রাজনৈতিক হত্যা

তসলিমা নাসরিন

লিখিত সংবিধান ছাড়া যুক্তরাজ্য চলছে, নিউজিল্যান্ড চলছে, কানাডা চলছে। বাংলাদেশ কী এমন কী হয়ে গেল যে সংবিধান ছাড়া চলছিল না? সংবিধান থাকার মানেটা কী? কবে এই সংবিধানের কী মেনেছে শুনি! সংবিধানের মূল নীতি ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা। এই দেশ গণতন্ত্র মেনেছে? মানেনি। গণতন্ত্র মানে তো শুধু ভোটাভুটি নয়, সকলের সমান অধিকারের নামও গণতন্ত্র। নারীর অধিকার তো পারিবারিক আইনে পুরুষের অধিকারের সমান ছিল না। নারী বঞ্চিত হয়েছে। কাউকে যদি ধর্মীয় আইন এনে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে গণতন্ত্র বলতে সংবিধানে কিছু থাকা আর না-থাকা সমান কথা।

সমাজতন্ত্র কি মানা হয়েছে? ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান । এই ব্যবধান ঘোচানোর কোনও চেষ্টা কি হয়েছে? হয়নি। যতখানিই শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে, এতে ধনীকে আরও ধনী করা হয়েছে, দরিদ্রকে আরও দরিদ্র।

জাতীয়তাবাদেরই বা কী ছিল? চুরি -ডাকাতি -লুটপাট- অর্থ পাচার- খুন- ধর্ষণ -প্রতারণায় দেশের লোক ব্যস্ত থেকেছে, এইসবে জাতির কী উন্নতি হয়, দেশেরই বা কী লাভ হয়?

ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল সংবিধানে, তাই বলে সব ধর্মকে কোনওদিন সমান চোখে দেখা হয়েছে? মুসলমানের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে রায় দিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানের ধর্মকে তুচ্ছ করা হয়নি? হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে নির্যাতন করা হয়নি? হয়েছে।

নতুন সংবিধানে বহুত্ববাদ ঠাঁই পেয়েছে। এই বহুত্ববাদ কি আদৌ অসাম্প্রদায়িকতার জয়গান গাইবে? ভিন্ন রাজনৈতিক এবং দার্শনিক মতবাদকে নিরাপত্তা দেবে? মত প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে, সম্মান করবে?। তাহলে কোনও রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে না? কোনও নাস্তিকের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মামলা হবে না? এই গ্যারিন্টি কে দেবে?

আসলে বাংলাদেশের জন্য দরকার সেক্যুলারিজম, যার আক্ষরিক অর্থ ধর্মহীনতা। সভ্য হতে চাইলে রাষ্ট্রকে আর আইনকে ধর্মহীন হতেই হবে। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করতেই হবে। সভ্য হওয়ার প্রথম শর্ত এটিই। ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমাজে সব রকম মানুষ থাকবে, কেউ ধর্মে বিশ্বাস করবে, কেউ করবে না। ধর্মে বিশ্বাসীর স্থান অবিশ্বাসীর ওপরে রাখা হবে না। ধর্মের প্রচার এবং ধর্মের আরোপ--কোনওটিকেই গ্রহণ করা হবে না। অচিরে এইসব ব্যবস্থা না নিলে দেশটি পেছনে যেতে যেতে ঙ্খন্দ্ধ ঙ্ভ্র্ন্-এ নির্ঘাত ঢুকে যাবে। তখন কিন্তু শত শত বছর আলো ফেলেও দেশটিকে আলোকিত করা সম্ভব হবে না।

উড়ে এসে জুড়ে বসা জিহাদি সরকার যাকে পছন্দ হচ্ছে না, তাকেই সন্ত্রাসী পাঠিয়ে খুন করছে, নয়তো জেলে ঢোকাচ্ছে । জেলের ভেতর টুপটাপ মরছেও মানুষ। রোগশোকে মরছে, নাকি মেরে ফেলা হচ্ছে? অধিকাংশের ধারণা মেরে ফেলা হচ্ছে।

সংগীত শিল্পী প্রলয় চাকীকেও জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে গত ১৬ই ডিসেম্বরে। কোনও মামলা ছিল না তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর অপরাধ একটিই, তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন।

আওয়ামী লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল ছিল বাংলাদেশে, সেটির প্রচুর সদস্য ছিল, সমর্থক ছিল। নির্বিচারে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই এখন জিহাদি সরকারের উদ্দেশ্য। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু প্রলয় চাকী পালাতে চান নি। তিনি ভেবেছিলেন তিনি কোনও অন্যায় করেননি, তিনি পালাবেন কেন।

খুব সম্ভব নিজেরাই মেরে এখন প্রচার করছে যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন চাকী। যারা জেলে আছে, তাদের সবাইকে কি এক এক করে এরকমভাবে মেরে ফেলা হবে?

জেলের বাইরের মবসন্ত্রাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। জেলের ভেতরের সন্ত্রাস কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। জেলের ভেতর কীভাবে হত্যাকাণ্ড চলে, তা জানতে চাই আমরা। জেলে যারা আছে, তারাও নাগরিক, তাদেরও নাগরিক অধিকার আছে বাঁচার এবং বিচারে পাওয়ার।

উড়ে এসে জুড়ে বসা জিহাদি সরকার যাকে পছন্দ হচ্ছে না, তাকেই সন্ত্রাসী পাঠিয়ে খুন করছে, নয়তো জেলে ঢোকাচ্ছে । জেলের ভেতর টুপটাপ মরছেও মানুষ। রোগশোকে মরছে, নাকি মেরে ফেলা হচ্ছে? অধিকাংশের ধারণা মেরে ফেলা হচ্ছে।

সংগীত শিল্পী প্রলয় চাকীকেও জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে গত ১৬ই ডিসেম্বরে। কোনও মামলা ছিল না তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর অপরাধ একটিই, তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন।

আওয়ামী লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল ছিল বাংলাদেশে, সেটির প্রচুর সদস্য ছিল, সমর্থক ছিল। নির্বিচারে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই এখন জিহাদি সরকারের উদ্দেশ্য। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু প্রলয় চাকী পালাতে চান নি। তিনি

ভেবেছিলেন তিনি কোনও অন্যায় করেননি, তিনি পালাবেন কেন। খুব সম্ভব নিজেরাই মেরে এখন প্রচার করছে যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন চাকী। যারা জেলে আছে, তাদের সবাইকে কি এক এক করে এরকমভাবে মেরে ফেলা হবে?

জেলের বাইরের মবসন্ত্রাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। জেলের ভেতরের সন্ত্রাস কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। জেলের ভেতর কীভাবে হত্যাকাণ্ড চলে, তা জানতে চাই আমরা। জেলে যারা আছে, তারাও নাগরিক, তাদেরও নাগরিক অধিকার আছে বাঁচার এবং বিচারে পাওয়ার।

ইতিহাস

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

মজিবুর রহমান

ভারত একটি বহু ধর্মীয় বিশাল দেশ। অনেক ধর্মের উৎপত্তি স্থল। দেশবাসীর প্রায় সকলেই ধর্ম বিশ্বাসী। ধর্ম যখন উপাসনালয় ও সামাজিক পরিসরে অল্পস্বল্প অনুশাসন মেনে চলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু ধর্ম যখন রাজনীতির অঙ্গনে চলে আসে এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অংশ হয়ে ওঠে তখন সমস্যার শেষ থাকে না। আর, ধর্ম যখন কোনো জনগোষ্ঠীর মাথাব্যথার কারণ হয় তখন তার ওষুধ সহজে পাওয়া যায় না। ভারতের সেই দুর্ভাগ্যই হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর সাড়ে সাত দশক কেটে গেলেও ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির দ্বন্দ্ব অব্যাহত আছে।

মূলত বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হয়। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বধর্মীয় রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুবৃহৎ পরিধির বাইরে ১৯০৬ সালে মুসলিমপন্থী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এবং ১৯১৫ সালে হিন্দুপন্থী রাজনৈতিক দল হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। পরে আরও অনেক সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয়দের এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উৎসাহিত করে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট ভারত ভাগ হয়ে যায়। নবগঠিত পাকিস্তান ২৫ বছরের মধ্যেই ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়। গঠিত হয় বাংলাদেশ। ভারত থেকে আর কোনো নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎপাত ভারতের অভ্যন্তরীণ অশান্তির স্থায়ী কারণ হয়ে রয়ে গেছে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি আজীবন অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুশীলন করে গেছেন। এবিষয়ে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সুভাষচন্দ্র ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ে বিভিন্ন ভাষণে তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ওপর জোর দেন। ১৯২৮ সালের এপ্রিলে রাজশাহীতে একটি জনসভায় তিনি বলেন, 'হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক-- ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হইতে পারে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় তো কাহাকেও রেহাই দেয় না। শিক্ষা সমস্যা, বেকার সমস্যা, রোগ প্রতিরোধের সমস্যা ইত্যাদির সমাধানে হিন্দুও যেমন আগ্রহী মুসলমানও তেমনই আগ্রহী।' ওই বছরই মে মাসে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক সভায় তিনি তাঁর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন এই ভাবে, 'সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় বাধা হল ধর্মীয় উন্মাদনা। আর ওই ধর্মীয় উন্মাদনার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বড় ওষুধ আর নেই।'

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জেমস রামসে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের জন্য যে 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করেন তাতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, ইঙ্গ-ভারতীয় ও অনুন্নত শ্রেণির (দলিত) জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার কথা বলা হয়। গান্ধীজি ও ডঃ বি আর আম্বেদকরের মধ্যে স্বাক্ষরিত পুনা চুক্তির ফলে অনুন্নত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে তাদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত রেখে হিন্দুদের সাথে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা (আসন সংরক্ষণ) চালু হয়। সুভাষচন্দ্র এতে খুশি হননি। তিনি ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি নির্ধারণের 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা' পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির পরিবর্তে বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রের অনুমান সঠিক ছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা, উভয় সাম্প্রদায়িক ধারারই কঠোর সমালোচক ছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে জাতীয়

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তিনি কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা কিংবা মুসলিম লীগের দ্বৈত সদস্যপদ নিষিদ্ধ করেন। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে এক মহাজাতিক ঐক্য গঠনের প্রয়াসে তিনি মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দ্বিধা করেননি। যদিও তাঁকে হতাশ হতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'মিঃ জিন্নাহ তখন কেবল ব্রিটিশদের সহায়তায় পাকিস্তানের ধারণা কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সে সম্পর্কে ভাবছিলেন।... মিঃ সাভারকার কেবল ভাবছিলেন কিভাবে হিন্দুরা ভারতে ব্রিটেনের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এই সাক্ষাৎকারগুলি থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম যে মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভার কাছ থেকে কিছুই আশা করা যায় না।'

সুভাষচন্দ্র বসু অতীতকালের মুসলিম শাসকদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৩৩-৫৭) ছিলেন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী একজন শহীদ। তিনি ১৯৪০ সালের ৩ জুলাই 'সিরাজউদ্দৌলা দিবস' পালন এবং হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের ডাক দেন। ২ জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। ওই স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের (১৭৫১-৯৯) অসমসাহসী সংগ্রামের স্মরণে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের ইউনিফর্মের কাঁধে উল্লম্ফনরত ব্যাঘ্র আঁকা থাকতো। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রেঙ্গুনে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের (১৭৭৫-১৮৬২) সমাধি পরিদর্শন করে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানে তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। মুঘল শাসন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'দেশব্যাপী ঐক্য স্থাপন এবং সর্বব্যাপী অগ্রগতির কৃতিত্ব মুঘল বাদশাহদের জন্যই সঞ্চিত ছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাটদের শাসনকালে ভারতবর্ষ আরও একবার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়।"

সুভাষচন্দ্র বসুর দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গে মুসলিম সংযোগ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারি তিনি পাঠানের বেশে মহম্মদ জিয়াউদ্দিন ছদ্মনামে কলকাতা ছাড়েন এবং পেশোয়ারে পৌঁছে মোহাম্মদ আকবর শাহের বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জার্মানির কিয়েল বন্দর থেকে ডুবোজাহাজে রওনা হয়ে ৬ মে সুমাত্রা দ্বীপে পৌঁছান। এই বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী ছিলেন আবিদ হাসান। নেতাজির প্রতি আকর্ষণে এবং মাতৃভূমির মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলে যথাসম্ভব দান করার জন্য সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী মহম্মদ হাবিব এক কোটি টাকা দিয়ে নেতাজির গলার মালা কেনেন। নেতাজি মনিপুর ও নাগাল্যান্ড অভিযানের দায়িত্ব দেন যথাক্রমে মোহাম্মদ জামান কিয়ানি ও শাহ নেওয়াজ খানকে। জীবনের শেষ বিমান যাত্রায় একমাত্র সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেন কর্নেল হাবিবুর রহমানকে। যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে আজাদ হিন্দ সরকারের দায়িত্ব অর্পণ করেন এম জেড কিয়ানির ওপর। আজাদ হিন্দ ফৌজে মুসলিম সৈনিকের সংখ্যাধিক্য নিয়ে নেতাজি খুব খুশি ছিলেন।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ধর্মভিত্তিক পৃথক পৃথক 'কিচেন' বা রান্নাঘর থাকতো। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সকলের জন্য একই 'চৌকা' চালু করেন। ব্রিটিশ প্রশাসন আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈনিকদের জন্য ধর্ম অনুযায়ী পৃথক পৃথক রান্নাঘরের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই সৈনিকরা নেতাজি প্রবর্তিত রীতিকে সম্মান জানানোর জন্য বিভিন্ন রান্নাঘর থেকে খাবার এনে একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে খেতেন। নেতাজির বাহিনী ধর্মীয় মেলবন্ধনের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। লাল কেল্লার সামরিক আদালতে যে তিনজন সেনানায়কের বিচার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাঁরা হলেন শাহ নেওয়াজ খান, প্রেম কুমার সায়গল ও গুরুবক্স সিং ধীলন-- একজন মুসলমান, একজন হিন্দু ও একজন শিখ। তাঁর বাহিনীর স্লোগান ও অভিবাদন হিসেবে 'জয়হিন্দ' সব জাতের কাছে সমান জনপ্রিয় ছিল। বাহিনীর আদর্শ নির্ধারণে নেতাজি বেছে নিয়েছিলেন তিনটি উর্দু শব্দ-- ইত্তেফাক (একতা), ইতমদ (বিশ্বাস) ও কুরবানী (ত্যাগ)।

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়। নেতাজি ঘোষণাপত্র পাঠ করে জানান, 'এই সামরিক সরকার নিজের অধিকারবলে সকল ভারতীয়ের আনুগত্য দাবি করছে। সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমান অধিকার, সুযোগের অধিকার নিশ্চিত করা এই সরকারের কর্তব্য।' ১৯৪৫ সালে 'ভারতের মৌলিক সমস্যা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন,'স্বাধীন ভারতের সরকারকে সমস্ত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ ও পক্ষপাত শূন্য মনোভাব নিতে হবে এবং একজন ব্যক্তি যাতে তার নিজস্ব মত অনুযায়ী একান্তভাবে কোনও বিশেষ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।'

সুভাষচন্দ্র বসু ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ছিলেন। শরীরে রুদ্রাক্ষ ধারণ করতেন। পট্টবস্ত্র পরিধান করে কালীপূজা ও দুর্গাপূজা

করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মাচরণ এড়িয়ে চলতেন। আবিদ হাসান লিখেছেন,"নেতাজি ধর্মকে জাতীয়তাবাদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক রেখেছিলেন। যদিও তিনি নিজে প্রচণ্ড ধর্মপ্রাণ ছিলেন, কিন্তু জনসমক্ষে কোনো প্রকার ধর্মীয় প্রার্থনা অনুমোদন করতেন না।'

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে আজকের ভারতে তারই রমরমা চলছে। হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ প্রতিপন্ন করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাষ্ট্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন,'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' হ্যাঁ, ভারতের স্বাধীনতায় সব ধর্মের মানুষের রক্ত রয়েছে। কেউ কেউ এই সত্যকে অস্বীকার অথবা বিকৃত করার চেষ্টা করছে। সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও দর্শনকে যারা শ্রদ্ধা করে তারা অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে পারে না।

(লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(২)

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই যুদ্ধকে কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক ভাবেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে। এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে পার্টির কোনও মৌলিক মতপার্থক্য হয়নি। যদিও স্ট্যালিন ও হিটলার এর মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি হয় জওহরলাল তা খুব প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেননি। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে অত চিন্তা ভাবনা ছিলো না। কংগ্রেস ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে ভারতবাসীকে জড়িয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে।তাঁরা স্লোগান দেন ' না এক পাই না এক ভাই।' অর্থাৎ যুদ্ধে একটা পয়সা ও একজন ভাইকেও আমরা পাঠাবো না। গান্ধিজি যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দেন।

দাবি ছিল ভারতবাসীকে স্বাধীন সরকার গড়ার অধিকার দিলেই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নাৎসিদের বিরুদ্ধে সহায়তা দেওয়া হবে। এর ফলে সারা দেশে ব্যাপক গ্রেফতার ও দমনপীড়ন চলতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির উপরও আক্রমণ নেমে আসে। এমন অবস্থায় ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইংল্যান্ড-আমেরিকার সঙ্গে মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়।এদিকে ভারতবাসীকে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ বিষয়ে ক্রিপস মিশনের সুপারিশ কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪২ সালে ৮ আগস্ট মধ্যরাতে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ব্রিটিশ 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয় ও চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তে আসে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এখন জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব মিত্রশক্তির শরিক গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এখন কোনও আন্দোলন করা যাবে না বরং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে হবে। পার্টির প্রতিনিধিরা কংগ্রেস অধিবেশনে আগস্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার ফলে পার্টি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসিদ্ধ ঘোষণা করে।

৮ আগষ্ট এ.আই.সি.সি.অধিবেশনে মধ্য রাতে গান্ধিজি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলী, এই মাত্র আপনারা সভাপতি মৌলানা আজাদ আনীত যে প্রস্তাব বিপুল ভোটে গ্রহণ করলেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ, কিন্তু আমি তার থেকেও বেশি ধন্যবাদ জানাবো সেই তেরোজন (পড়ুন এআইসিসি'র সদস্য ১৩ জন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী) সাম্যবাদী বন্ধুকে যাঁরা নিশ্চিত পরাজয় জেনেও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। বিগত কয়েক দশকের ঘটনাবলি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে আশাহীন সংখ্যালঘু অবস্থাতেও যদি আমরা নিজ আদর্শে নিষ্ঠার সঙ্গে অবিচল থাকি, তাহলে একদিন আমাদের জয় হবেই। তবে আমার বন্ধুরা যদি সতর্কতার সঙ্গে মৌলানা আজাদ আনীত প্রস্তাবটি বিবেচনা করতেন, তাহলে তাঁরা দেখতেন যে, যে অধিকার তাঁরা চেয়েছেন, কংগ্রেস ইতিমধ্যেই তা স্বীকার করেছে। কংগ্রেস মনে করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিন যদি দানবীয় শক্তির পদানত হয় তাহলে ভারতের স্বাধীনতা অর্থহীন। স্বাধীন ভারতই সার্থকভাবে সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের পাশে দাঁড়াতে পারে। তাই আমরা চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের ডাক দিয়েছি। পরাধীন ভারত কখনই সার্থকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের জনগণকে প্রকৃত সহায়তা দিতে পারে না।'

কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়ে আর একটি গুরুতর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেটি হচ্ছে মুসলিম লিগের 'পাকিস্তান' দাবিকে সমর্থন। ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে লিগ তাদের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করে। মহম্মদ আলি জিন্নার বক্তব্য ছিল ' মুসলমান ও হিন্দুদের

ধর্ম, আচার-বিচার, জীবনধারণ, সংস্কৃতি সবই পৃথক। তাদের শুধু আলাদা ধর্মই নয়, আলাদা জাতিও।' এই দ্বিজাতিতত্ত্বের দাবি মুসলমান জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ বলে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে। এই মারাত্মক ভ্রান্তির বিষয়টি পার্টি পরে অনুধাবন করলেও, তা কখনো স্বীকার করা হয়নি।

দেশ ভাগের পর অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এই ভুল স্বীকার করে। তারা বলে যে ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারিত হতে পারেনা। বাংলার মানুষের অভিন্ন ভাষা, লোকাচার ও সংস্কৃতি আছে। ওই পার্টির এই বিশ্লেষণ সঠিক , পরবর্তীকালে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র ' বাংলাদেশের ' উত্থানে তা প্রমাণিত হয়েছে।

যাই হোক আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার জন্য পার্টির জনবিচ্ছিন্নতা পার্টি ক্রমশ কাটিয়ে উঠতে থাকে। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক শিল্পীদের মঞ্চে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের যোগদান, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাংলা ১৩৫০ এর ভয়াবহ মন্বন্তর প্রতিরোধে ত্রাণ কার্য, কৃষকদের তেভাগার সংগ্রাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের তরুণ সেনানায়ক ক্যাপ্টেন রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে, ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহের সমর্থনে শ্রমিকদের হরতাল ও ছাত্র আন্দোলন , কমিউনিস্ট পার্টিকে জনবিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে অতি বামপন্থী বিচ্যুতি দেখা দেয়। পার্টি মনে করে দেশ আদৌ স্বাধীন হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দেশ এখনও একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। এই সরকারকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে উচ্ছেদের ডাক দেওয়া হয়। পাটির সাধারণ সম্পাদক তখন বি.টি.রণদিতে। পার্টি শহরগুলিকে ঝড়ের কেন্দ্রে পরিণত করার ডাক দেয়। পার্টির সদস্যরা আত্মগোপন করেন। এই বঙ্গে কাকদ্বীপ, বড়াকমলাপুর, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে জমির আন্দোলনকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আন্দোলনে রূপান্তরিত করার ডাক দেওয়া হয়। হায়দরাবাদ রাজ্যে নিজামের স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে, ওই রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হবার পর, ওই সংগ্রামকে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত হয়। পার্টির বহু সদস্য গ্রেফতার হন। অনেকে নিহত হন। এক বছর পর পার্টির গোপন অধিবেশনে সি রাজেশ্বর রাও একটি বিকল্প দলিল পেশ করেন যা ' অন্ধ্র দলিল ' নামে খ্যাত, এতে বলা হয় শহর নয়, বিপ্লব করতে হবে চিনের পথে। অর্থাৎ গ্রাম দিয়ে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলতে হবে। রণদিভেকে সরিয়ে রাজেশ্বর রাওকে পার্টি সেক্রেটারি করা হয়। ১৯৪৯ সালে সারা দেশজুড়ে রেল ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। তাও ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়। এই সময় এস এ ডাঙ্গে, অজয় ঘোষ ও এস ভি ঘাটে যথাক্রমে পুরযোত্তম, প্রকাশ ও প্রভাকর ছদ্মনামে পার্টির মধ্যে একটি দলিল প্রচার করেন, যা থ্রি পি'স ডকুমেন্ট বলে পরিচিত। এতে বলা হয় ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন দেশ ও তার একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি আছে। এই দলিল প্রচারে পার্টির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় । অবশেষে কমিনফর্মের মুখপত্র ''ফর দি লাস্টিং অফ পিস পিপলস ডেমোক্রেসি'' এই মতকে সমর্থন করা হয়। পার্টি অবশেষে ভুল স্বীকার করে।

এই অতি বাম বিচ্যুতির ফলে পার্টি সাময়িকভাবে জনবিচ্ছিন্ন হলেও পার্টি কমরেডদের নিষ্ঠা, ত্যাগ, সহজ করল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁদের 'কমিউনিস্ট' হিসাবে সমাজে এক অনন্য সম্মান দেয়। কৃষক আন্দোলনের এলাকা ও শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে পার্টির প্রভাব পুনরুদ্ধার ও পার্টি বৃদ্ধির কাজে কমরেডরা আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫১ সালে পালঘাট কংগ্রেসে অজয় ঘোষ পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইনি ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদ এর বিপ্লবী দল Hindustani Socialist Republican Army ' র সহযোদ্ধা ছিলেন। পরে গত ৩ এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৫১-৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পটিকে কংগ্রেসের সুবিশাল প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। পার্টির প্রভাবাধীন এলাকাগুলি যথা হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা অঞ্চল, বাংলার শিল্পাঞ্চল ও কিছু কৃষক এলাকা ও বর্তমান কেরলের ত্রিবাঙ্গুর কোচিন রাজ্যে কংগ্রেসের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। যদিও শোষাক্ত এলাকায় সমাজবাদীদের কিছু প্রভাব ছিল। কংগ্রেসের মূল প্রচারক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল। তিনি তাঁর প্রচারে সর্বত্রই আরএসএস-এর রাজনৈতিক ফ্রন্ট জনসংঘের ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মূল আক্রমণ চালান। এমনকী তেলেঙ্গানা প্রচারে গিয়েও তিনি জনসংঘের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এই জাতিরাষ্ট্র ভবিষ্যতে এই সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িক শক্তির দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হবে। কয়েক বছর আগে সংঘ পরিবারের তাত্ত্বিক নেতা কে আর মালকানি, দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় সাংবাদিক কেবল ভার্মার সঙ্গে একটি বিতর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'নেহরু। অসৎ, তাই তিনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমালোচনা না করে, এমনকী তেলেঙ্গানাতে গিয়েও জনসংঘের বিরুদ্ধে উত্তরে কেবল ভার্মা বলেন 'নেহরু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলেই এই জাতিরাষ্ট্রের বিপদ কোনদিক থেকে আসবে তা বুঝতে পেরেছিলেন।'

যাই হোক, কংগ্রেস ১৯৫১-৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করে। এই দল ৩৬৪টি আসন পায়। বিধ্বস্ত হয়ে যায় ভারতীয় জনসংঘ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সামনে রেখে R.S.S এই দল গঠন করে। এরা মাত্র ৩টি আসন পায়। সদ্য আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি ১৬টি আসনে জয়লাভ করে। এর মধ্যে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে তারা ৮টি আসন পায়। পার্টির নেতা তেলেঙ্গানা সংগ্রামের নায়ক টি রবিনারায়ণ রেড্ডি দেশের মধ্যে সর্বাধিক ভোটে জয়লাভকরেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতারা যথা জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, আচার্য কৃপালনী ও ড. প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বাধীন সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির (পরে দুটি দল একত্র হয়ে প্রজা সোশালিস্ট পার্টি গঠিত হয়) একত্রে লড়ে ২৩টি আসন পায়। ড.বি আর আম্বেদকরের রিপাবলিকান পার্টি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। আম্বেদকর নিজেও হেরে যান এক অখ্যাত প্রার্থীর কাছে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান বিরোধীদল রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধিতে কমিউনিস্টদের দীর্ঘদিনের তৈরী করা জমি বিনষ্ট হয়নি। আর সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের শক্তিকে কংগ্রেস পরাস্ত করায়, কমিউনিস্টদের তৈরি করা জমিও তারা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক শক্তি বিনষ্ট করতে পারেনি। (চলবে)

ইলা মিত্রের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

বাসু আচার্য

বছর শেষে একটা বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা-নেত্রী কমরেড রমেন মিত্র এবং কমরেড ইলা মিত্রের বাড়ি। আমার সদ্য প্রয়াত বন্ধু ঋতেন্দ্রনাথ ওঁদের নাতি। নানান কথা হল রমেন মিত্র এবং ইলা মিত্রের পুত্র মোহন মিত্রের সঙ্গে। বলতে বলতে উঠে এলো এই প্রসঙ্গ যে, আজকে ইলা মিত্রকে যেভাবে তাঁর রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে, সেটা যে কী ভয়ংকর, সেই নিয়ে। মনে রাখতে হবে যে, কমরেড ইলা মিত্র তেভাগা আন্দোলনের জঙ্গি নেতৃত্বের অংশ যেমন ছিলেন, নাচলের সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম বীরাঙ্গনা যেমন ছিলেন, তেমন তিনিই কিন্তু পরবর্তীকালে ছিলেন কমরেড ভবানী সেনের নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব লাইনের অনুগামী, সোভিয়েত মার্কিন দ্বিমেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিপরীতে কমিউনিস্ট-কংগ্রেস ঐকের পক্ষের মানুষ। এমনকি, ১৯৭৮ সালে সিপিআইএর ভাতিণ্ডা কংগ্রেসের পরবর্তীতে রাজ্যে রাজ্যে যে ডাঙ্গেপন্থী কনসোলিডেশন হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে তার অংশ ছিলেন তিনি। এখানে যে ন'জন রাজ্য পরিষদ সদস্য সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমরেড ইলা মিত্র এবং কমরেড মহম্মদ ইলিয়াস। ইলা মিত্র ১৯৬২ সালে নির্বাচনে জিতে প্রথম এমএলএ হন, মুজফফর আহমদের অনুরোধে। দীর্ঘদিন এমএলএ ছিলেন, তারপর ১৯৭১ সালের বাই-ইলেকশনে সিপিএমের অনিলা দেবীর বিরুদ্ধে পরাজিত হন। তবে ৭২এ কংগ্রেস-কমিউনিস্ট জোট গড়ে উঠলে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী আবহে আবারও বিজয়ী হন, এবং ৭৭ সাল অবধি বিধানসভার সদস্য থাকেন। এরপর থেকে সিপিআইএর রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের কারণে ক্রমশ তিনি রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যান এবং স্বাভাবিকভাবেই পার্টিতে তাঁর নেতৃত্বকারী ভূমিকা কমতে থাকে। অভ্যন্তরীণ দলবাজির শিকারও হয়েছিলেন। মানিকতলা থেকে তুলে এনে শেয়ালদায় সোমেন মিত্রর বিরুদ্ধে ইলেকশনে দাঁড় করানো এই দলবাজিরই অভিপ্রকাশ বলে অনেকে মনে করেন। পরবর্তীকালে ইসকাস এবং মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যদিও প্রথমোক্ত অর্গানাইজেশনের বেকার হল সম্মেলন (১৯৭৮) থেকে তিনি সংগঠনে সম্পূর্ণভাবেই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যান। এই সম্মেলনে ডাঙ্গেপন্থী হিসেবে পরিচিত তরুণ সান্যালকে এবং তার সঙ্গে থাকা ইলা মিত্রসহ আরও অনেককে তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে হারিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাই বলে যে তিনি বিরোধীদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করবেন, এরকম মানুষ ইলা ছিলেন না। অনেকেই হয়তো জানেন না, নিজে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইনে আস্থা রাখলেও, রমেন মিত্র এবং ইলা মিত্র উভয়েই নকশালপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন নকশালপন্থীদের লাইন ভুল, কিন্তু নকশালপন্থীরা যা করছেন, তা বিপ্লবের স্বার্থেই করছেন, এবং সেই কারণে তাঁদের পাশে থাকা উচিত। থানায় গিয়ে নকশালপন্থী যুবককে ক্ষ্মআমার পার্টি মেম্বারক্ষ্ম বলে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসার ক্ষমতা সেদিন ইলা মিত্রের ছিল, ক্ষমতা ছিল নকশালপন্থী যুবককে ছড়িয়ে আনার জন্য সরাসরি রাইটার্সে গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে আসার, এবং সেই ক্ষমতা তিনি একাধিকবার দেখিয়েছেন। নিজের বাড়িটাকে নকশালপন্থীদের শেল্টারে অব্দি পরিণত করেছিলেন। এই ইলা মিত্রকে বুঝতে গেলে কিছু কাঠখড় পোড়াতে হবে। বুঝতে হবে রমেন মিত্রকে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধেও রমেন এবং ইলার অবদান নেহাত কম নয়। স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পেছনে যাঁর মতাদর্শগত মস্তিষ্ক কাজ করেছিল, তাঁর নাম

ভবানী সেন। প্রতুল লাহিড়ী, শান্তিময় রায়দের দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে কনভিন্স করার কাজটা তিনি করেছিলেন। আজকে যারা বাংলাদেশ নিয়ে প্রচুর ফাটায়, তারা কেউ ভবানী সেনের নামটা করে না। রমেন মিত্র, ইলা মিত্রর ওই পায়রার খোপের মতো সরকারি ফ্ল্যাটটা একসময় ছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ভারতীয় কেন্দ্র। আজকে যারা বাংলাদেশ নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলে, তারা সেটা জানে কি? যাইহোক, শুভাশিসদা (মুখোপাধ্যায়) আর ওমর তারেক চৌধুরী পিবিএস থেকে ইলা মিত্রর ওপর খুব ভালো একটা বই করছে। সেখানে অনেক তথ্য থাকবে, থাকবে অনেক রেয়ার ডকুমেন্ট। পাঠক দয়া করে কিনবেন। ঠকবেন না, এটুকু বলতে পারি। যারা ইলা মিত্রকে নিয়ে খণ্ডিত ইতিহাস সামনে তুলে আনছে, তাদের প্রতি আমার অভিসম্পাত রইলো। প্রকৃত ইতিহাস উঠে আসুক, পুরো মানুষটা আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হোক এই শতবর্ষে, এইটুকুই আমার আশা। আর হ্যাঁ, মেটিরিয়াল আমার কাছে অনেক কিছু আছে, কিন্তু সে-সব দিলাম না। সেগুলো শুভাশিসদা আর ওমর তারেক চৌধুরীর বইতে পাবেন। আমি নিজে যেহেতু পরিচয়-এর সঙ্গে যুক্ত, সেই কারণে আমার প্রাক্তন সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইলা মিত্রর একটা ছবি নিচে পোস্ট করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আবারও বলছি, ইলা মিত্রকে নিয়ে কাজ করতে গেলে তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক সত্তাকে ধরে কাজ করবেন। ধন্যবাদ।

পরিবেশ

জলের চরম সঙ্কটেও সংক্রমিত পানীয় জল খেয়ে মৃত্যুর মিছিল

রাহুল রায়

নর্দমার ময়লা জল গিয়ে মিশেছে পানীয় জলের পাইপ লাইনে। সংক্রমিত সেই জল খেয়ে বিগত জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩৪ জনের। দেশের ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৬টি রাজ্যের রাজধানী সহ অন্তত ২৬টি শহরে নর্দমার ময়লা জল মেশা পাইপ-লাইনের জল খেয়ে কমপক্ষে ৫৫০০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রাজ্যগুলির সরকারি বিবৃতি এবং গণমাধ্যমের নানান প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, আন্ত্রিক রোগে সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরপর দেখা দিয়েছিল টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ও দীর্ঘস্থায়ী জ্বর।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে এ বছর ৭ জানুয়ারির মধ্যে মাত্র এক মাসেই অন্তত ১৯ জন মারা গিয়েছেন পাইপ লাইনের সংক্রমিত জল খেয়ে। ৩৫০০ জনের বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের নানান শহর থেকে পাইপ লাইনের জল সংক্রমণের অন্তত ১১টি ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। এই শহরগুলি হল পাটনা (বিহার), রায়পুর (ছত্তিশগড়), বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক), দেরাদুন (উত্তরাখণ্ড), গান্ধিনগর (গুজরাট), গুয়াহাটি (অসম), রাঁচি (ঝাড়খণ্ড), ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ), চেন্নাই (তামিলনাড়ু) এবং গুরুগ্রাম (হরিয়ানা)। এদের মধ্যে রাজধানী শহর ছিল ভারতের ৯টি রাজ্যের। এই সমস্ত ঘটনা যে কেবল ভারতের দীর্ঘস্থায়ী বছরভর শহুরে সংকটকে তুলে ধরেছে তাই নয়, দেশের শহুরে পানীয় জল সরবরাহের মান্ধাতা আমলের ভঙ্গুর পরিকাঠামোকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে।

পানীয় জল সংক্রমণের কারণ

ভারতে জল দূষণের প্রাদুর্ভাবকে প্রায়ই বর্ষাকালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, যখন বন্যা এবং উপচে পড়া নর্দমার ময়লা জল পানীয় জলে মেশার ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু বিগত এক বছরের অন্তত ৩৪টি জল দূষণের ঘটনার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, পাইপ লাইনের জলে নর্দমার ময়লা জল মেশা এখন আর কেবল কোন মরশুমি ঘটনা নয়। ভারতজুড়ে বিভিন্ন শহরে এই সমস্যার কারণ আশ্চর্যজনকভাবে একই রকম। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দূষণের উৎস হিসেবে নর্দমার ময়লা জল পানীয় জলের পাইপ-লাইনে মিশেছে। কীভাবে? পুরানো হয়ে যাওয়া ও ঠিকমত না-বসানো জলের পাইপগুলো শৌচাগার ও নর্দমার খুব কাছে দিয়ে গিয়েছে। এই সব পাইপের ফুটো দিয়ে এবং চাপের তফাতের কারণে শৌচাগার ও নর্দমার নোংরা জল সরাসরি বাড়ির জল সরবরাহের সংযোগস্থলে মিশেছে। দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কয়েক দশক পুরানো জলের পাইপ লাইনে এই ঘটনা ঘটেছে। ভারতের অনেক শহর এখনও চার দশক আগের জলসরবরাহ ব্যবস্থাপণ নির্ভরশীল। 'দিল্লি জল পর্ষদ'-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের রাজধানী শহরেই প্রায় ১৮ শতাংশ জলের পাইপ ৩০ বছরেরও বেশি পুরানো। এসব পাইপ সাধারণত নর্দমার পাশে বা নিচে বসানো হয়। ফলে পাইপের যে কোন ফাটল দিয়ে সবসময় এক দূষণের ঝুঁকি থেকেই যায়।

জল সংক্রমণে ইন্দোরে মর্মান্তিক ঘটনা

দেশের পরিছন্নতম শহর মধ্যপ্রদেশে-এর ইন্দোর। সেখানেও শহরের পানীয় জল সরবরাহের মূল পাইপ লাইনে মিশেছে নর্দমা বা নিকাশী নালার ময়লা জল। বিগত ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ থেকে এই

সংক্রমিত জল খেয়ে শুরু হয় ভগীরথপুরার মানুষের অসুস্থতা। তিনজনের মৃত্যু হয়। সামনে আসে এই সংক্রমিত জলের ঘটনা। ৬ জানুয়ারির (২০২৬) মধ্যে আন্ত্রিক রোগে কমপক্ষে ১৭ জন মানুষ মারা যান। ২০০ জনেরও বেশি মানুষ অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এই বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে নানান গণমাধ্যমে প্রকাশিত সরকারি বিবৃতিগুলো স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কার সাথে মিলে গিয়েছে। সরকারি তদন্তে উঠে এসেছে বেশ কিছু গাফিলতি। ইন্দোরে পানীয় জল সরবরাহকারী প্রধান পাইপ লাইনের ঠিক ওপরেই তৈরি হয়েছিল এক শৌচাগার, যার কোন যথাযথ সেপটিক ট্যাংক ছিল না। জল সরবরাহের পাইপেও ফুটো ছিল। এখান দিয়েই শৌচাগারের মলমূত্রসহ দূষিত নিকাশি জল পানীয় জলে মেশার সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তবে ভবিষ্যতে এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

কেবল ইন্দোর নয়

ইন্দোরের এই ঘটনাটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতে বছরভরই এমন ঘটনা ঘটছে। ইন্দোরের ঘটনাটি এই বিপদটিকে সামনে এনেছে। ২০২৬-এর জানুয়ারি মাসের শুরুতে গুজরাটের রাজধানী গান্ধিনগরে দূষিত জল খেয়ে ১৫০ জনেরও বেশি শিশু টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ৪ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে কেএসএফসি লেআউট লিঙ্গরাজাপুরমের অন্তত ৩০টি পরিবার আন্ত্রিক ও পেটের রোগে আক্রান্ত হয়। এই মাসেই আরও অন্তত ৬টি শহর থেকে একই ধরনের খবর পাওয়া গিয়েছে। বিহারে পাটনার কঙ্করবাগ আবাসন কলোনির বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, সেখানকার বেশ কয়েকটি ব্লকের জল এতটাই দূষিত যে, তা মানুষের গায়ে লাগলে চুলকানি হয়। ফলে এই জলে স্নান করা বা কাপড় কাচা যায় না। বাসিন্দারা এই ঘটনার জন্য নর্দমার পাশে বসানো বেশ কয়েক দশকের পুরানো জলের পাইপগুলোর ফেটে যাওয়াকে দায়ী করেছেন। এঁদের অভিযোগ, বারবার বলা হলেও স্থানীয় পুরসভা কেবল সাময়িকভাবে মেরামত করে যায়, সমস্যার স্থায়ী সমাধানে একেবারেই উদাসীন।

ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে কাচনা আবাসন পর্ষদ এলাকার বাসিন্দারা প্রায় এক মাসেরও বেশি দুর্গন্ধযুক্ত দৃশ্যত ময়লা জল পাইপ লাইনে পাচ্ছিলেন। এতে প্রায় ১০০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে পুর আধিকারিকরা ৩০০টিরও বেশি জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত, ভাঙা বা ফাটা পাইপ লাইনের দেখা পেয়েছেন। জল সরবরাহের সময় এই সব ফাটা ভাঙা জায়গা দিয়ে নর্দমার ময়লা জল মেশার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লির গুরুগ্রাম, যেখানে সুউচ্চ বহুতলে নিজস্ব জল সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেও জল সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ডিসেম্বর ২০২৫-এর গোড়ায় ৭০এ সেক্টরে প্রায় ৭০ জন বাসিন্দা কলের জল খেয়ে আন্ত্রিক ও পেটের রোগে আক্রান্ত হন। এঁদের ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

আমাদের রাজ্যে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলেও জল সংক্রমণে মানুষের অসুস্থতার সংখ্যা বা নজিরিটি একেবারে ফেলনা নয়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কামারহাটি পুরসভার নানান ওয়ার্ডে তীব্র আন্ত্রিক রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ২০০ জনেরও বেশি রোগাক্রান্ত মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আমঝরা ১০, আমঝরা ১১ এবং মাঝনিপাড়া ১১ গ্রামের নানান বয়সী প্রায় ১০০ জন মানুষ হঠাৎ আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৫ সালেও কলকাতার কিছু বস্তি অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় ত্রুটিপূর্ণ জলনিকাশি ব্যবস্থায় কলের জলের পাইপলাইনে নোংরা জল মিশে, দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা (স্যানিটেশন) ও বন্যার উপচে পড়া সংক্রমিত জলে টিউবয়েলের জলদূষণে বিক্ষিপ্তভাবে মানুষের আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হবার ঘটনা ঘটেছে।

অকর্মণ্য প্রশাসন, পরিণতি জল সংক্রমণ ও মৃত্যু মিছিল

ভারতের সংবিধানে দেশের প্রতিটি মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার স্বীকৃত। এজন্য চাই নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, সর্বোপরি দূষণহীন পরিবেশ। ভারতের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে প্রতিটি মানুষকে স্থানীয় প্রশাসন যেমন পুরনিগম, পুরসভা ও পঞ্চায়েত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ও তার গুণমান বজায় রাখার জন্য সাংবিধানিকভাবে দায়ী। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, জল সরবরাহ পর্ষদ এবং নগর উন্নয়ন বিভাগ সহ রাজ্যস্তরের অন্যান্য সংস্থা রাজ্যজুড়ে জল সরবরাহ ব্যবস্থার অর্থায়ন, রূপরেখা তৈরি ও তার পরিচালনাও করে। জনস্বাস্থ্য নজরদারির দায়িত্ব রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের। অন্যদিকে, কোন রোগ বা সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন 'সমন্বিত রোগ নজরদারি কর্মসূচি' দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতীয় স্তরে, কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক 'অটল মিশন ফর রেজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন' (অম্রুত) এবং 'অম্রুত ২.০'-এর মত কর্মসূচির মাধ্যমে শহুরে জল সরবরাহের পরিকাঠামো তত্ত্বাবধান করে। আর পানীয় জলের গুণমানের মান নির্ধারণ করে 'ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস'। এখানে বলার, কেন্দ্রীয় সরকার 'জল নিরাপদ' শহর তৈরির ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে ২০২১ সালের ১ অক্টোবর 'অম্রুত ২.০' চালু করেছে।

এরই এক অংশ হিসেবে জলের গুণমান, পরিমাণ এবং সরবরাহের নিরিখে শহরগুলোর মূল্যায়নের জন্য এক প্রতিযোগিতামূলক সমীক্ষা হিসেবে 'পেয় জল সর্বেক্ষণ' চালু হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও বারবার রোগ বা সংক্রমণের ঘটনা থেকে আমাদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না যে, মানুষ অসুস্থ হলে বা মারা গেলেই কেবল প্রশাসনের হুঁশ ফেরে। অন্যথায় অন্ধই থাকে। পুনরাবৃত্ত এই ঘটনাগুলি কেবল বিচ্ছিন্ন কোন ত্রুটি বা গাফিলতি নয়। বরং প্রশাসনের নাগরিক জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনার এক পদ্ধতিগত চূড়ান্ত ব্যর্থতা, যা মানুষের নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার ভঙ্গের বিষয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। পাইপ লাইনে আমরা যে জল পাই, তার গুণমান আমরা জানতে পারি না। একই কথা প্রযোজ্য হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-কাছারির ক্ষেত্রেও। আমাদের রাজ্যের বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা রয়েছে। জনপ্রতিনিধিরাও কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে এ বিষয়ে উদাসীনই থাকেন। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বদলে দেশের সর্বত্র এখন বোতলবন্দি জলের রমরমা। এদের গুণমান নিয়ে কেউ চিন্তিত বলেও মনে হয় না। দেশের সবচেয়ে বড় সরকারি দপ্তর ভারতীয় রেলে সফরকালেও সেখানে বোতলবন্দি জল দেওয়া হয়। কয়েক বছর আগে দিল্লির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অভিযোগ করেছিল, বোতলবন্দি এসব জলে কীটনাশক মিলেছে। আর কে না জানে বোতলবন্দি এসব পানীয় জলের আড়ালে রয়েছে কোটি কোটি টাকার মুনাফার খেলা।

ভারতের জলচিত্র

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 'অক্ষত' প্রকল্পের অধীনে সমীক্ষিত ৪৮৫টি শহরের মধ্যে ৪৬টি শহর তাদের বাসিন্দাদের ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করার কথা জানিয়েছে। এর মানে, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অব্দি সমীক্ষিত শহরগুলোর মধ্যে ১০ শতাংশেরও কম শহর এই মানদণ্ডে পৌঁছাতে পেরেছে। শহুরে জল সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে বছরের পর বছর নানা বিনিয়োগ হয়েছে। উচ্চাভিলাষী নানান লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে। তবুও দেশের লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর জন্য পাইপলাইন-বাহিত নিরাপদ জল সরবরাহ এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় অনুমান করা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ শহরে বসবাস করবে। এটি দেশের নানান শহরে সেকেলে জল সরবরাহ ব্যবস্থার নাগরিক পরিষেবার ওপর চাপ আরও বাড়াবে।

ভারতের জল শক্তি মন্ত্রকের এক বিবৃতি (০৯.১২.২০১৯) জানাচ্ছে, নীতি আয়োগ প্রকাশিত 'কম্পোজিট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স' প্রতিবেদন (অগাস্ট, ২০১৮) অনুযায়ী ভারত তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ জল সংকটের মুখোমুখি। প্রায় ৬০ কোটি মানুষ উচ্চ থেকে চরম জলকষ্টে রয়েছে। প্রতিবেদনে এটিও উল্লিখিত হয়েছে, জলমানের সূচকে ভারত পৃথিবীতে ১২২টি দেশের মধ্যে ১২০তম স্থানে রয়েছে। দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ ভৌমজলই দূষিত। ইন্ডিয়া ডেটা ম্যাপ জানাচ্ছে, দেশের ৭০ শতাংশ জলাশয় দূষিত হয়ে পড়ায় ২০২৫ সালে ভারত রীতিমতো নির্মল জলসঙ্কটে ভুগেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক জানাচ্ছে, যখন মাথাপিছু জলপ্রাপ্তি বছরে ১০০০ ঘনমিটারের কম হয়, সেই অবস্থাকে জলসঙ্কট বলে। মাথাপিছু জলপ্রাপ্তি বছরে ১৭০০ ঘনমিটারের কম হলে তাকে জলকষ্টে ভোগা বলে। ভারতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ বাস করে। আর সমগ্র পৃথিবীর মিঠাজলের ভাঁড়ারের মাত্র ৪ শতাংশ রয়েছে এই দেশে। ২০২১ সালে ভারতে মাথাপিছু জলপ্রাপ্তি বছরে ছিল ১৪৮৬ ঘনমিটার। সরকারি হিসেবে ২০৫০ সালে বছরে মাথাপিছু জলপ্রাপ্তি দাঁড়াবে ১১৪০ ঘনমিটারে। নীতি আয়োগের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর পর্যাপ্ত নিরাপদ জল না পেয়ে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। প্রতিবেদনটিতে আশঙ্কা করা হয়েছে, ২০৩০ সালে দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানীয় জল পাবে না।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দেশের ৩২৩টি নদীতে সমীক্ষা চালিয়ে প্রায় ৩৫০টি দূষিত নদী এলাকা চিহ্নিত করেছে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন, জৈবরাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা, পিএইচ মান এবং কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির সংখ্যার নিরিখে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত মোট ৩৬টি অঞ্চলের ২০২৫ সালের জলের গুণমানের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকৃত 'স্টেট-ওয়াইজ ওয়াটার কোয়ালিটি ইনডেক্স ইন ইন্ডিয়া' অনুযায়ী দেশের শীর্ষে রয়েছে মিজোরাম (স্কোর বা মান ৯২.৫)। সর্বশেষে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি (মান ৫০.০)। আমাদের রাজ্যের স্থান ২৬তম (মান ৬৭.০)। জলের গুণমানের নিরিখে দেশের জাতীয় গড় ৭৩.৮ শতাংশ। এখানে বলার, যার মান যত বেশি, সেখানকার জল পেয় হিসেবে ও সেচকার্যে ততই উপযুক্ত। দেশজুড়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জলের গুণমান সূচকের এই স্থানাধিকারের তালিকাটি আঞ্চলিক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জনঘনত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে গড়িমসি ও দুর্নীতি আমাদের সামনে তুলে ধরে। প্রবন্ধের মিত পরিসরের কারণে সেই আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

অতঃকিম

ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জলছবির মধ্যে এক চিলতে আশার আলো দেখিয়েছে ওড়িশার উপকূলীয় শহর পুরি। উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত 'ড্রিঙ্ক ফ্রম ট্যাপ' প্রকল্প ২৪ ঘণ্টাই এখানে জাতীয় বিশুদ্ধ জলের মানদণ্ড অনুযায়ী জল সরবরাহ করে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির ফলে এটি সম্ভবপর হয়েছে। দেশের অন্যান্য শহরেও প্রয়োজন অনুরূপ রাজনৈতিক সদিচ্ছা। ধারাবাহিক বিনিয়োগ। দেশের জল দূষণ নিবারণ আইন যথাযথ কার্যকরী হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে প্রশাসনিক কঠোর নজরদারি। না হলে এই মৃত্যু-মিছিল চলতেই থাকবে।

শেষে বলার, ২০১৫ সালে জাতিপুঞ্জের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রকে নিয়ে আর্ত এই পৃথিবীকে বাঁচাতে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' (এসডিজি) শুরু হয়েছিল। এর ১৭টি লক্ষ্য আছে। বলা হয়েছিল, ২০৩০ সালের মধ্যে কোন রাষ্ট্রই এসব লক্ষ্যের নিরিখে সামগ্রিক উন্নয়নে পিছিয়ে থাকবে না। এসডিজি ৬ লক্ষ্যে রয়েছে নির্মল জল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। নাগরিকদের উন্নততর পরিষেবার পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২৫' অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষের আর মাত্র ৫ বছর আগেও এসব লক্ষ্যপূরণে আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি ও অসাম্য রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ভারতের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য কাঠামোয় বেশ কয়েকটি এসডিজি গঠনে 'চাবি-সূচক' অনুপস্থিত বা বিবেচিত হয়নি, যেমন- এসডিজি ৬-এ সরাসরি জল ধরে তার গুণমান যাচাইয়ের কোন সুযোগই নেই।

(কৃতজ্ঞতা : শ্রী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, সমাজ ও পরিবেশ কর্মী।
সাহায্য নিয়েছি — কিরণ পাণ্ডে: 'আনসেফ ওয়াটার, ইয়ার-রাউন্ডঙ্ক ওভার ফাইভ থাউজ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফেল সিক, থার্টি ফোর ডায়েড ডিউ টু কন্ট্যামিনেটেড ট্যাপ ওয়াটার অ্যাক্রস ইন্ডিয়া ইন লাস্ট টুয়েলভ মান্থস'; ডিটিই, ০৮.০১.)

স্মরণ

বামপন্থী নেতা সমীর পুততুণ্ড

গত ১১ জানুয়ারি, রবিবার, রাত সাড়ে ১১ টায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হলেন পিডিএস (পার্টি ফর ডেমোক্রেটিক সোসালিজম) এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সমীর পুততুন্ড। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৩ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হলেন। একসময় সিপিআইএম-এর দাপুটে নেতা ছিলেন সমীর পুততুন্ড। নিজের দল পিডিএস গঠনের আগে তিনি ছিলেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক। সিপিএম এ থাকাকালীন তিনি দলের ভিতর জ্যোতি বসু পন্থি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। জ্যোতি বসুর সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সুসম্পর্ক। মানতেন সুভাষ চক্রবর্তীর নেতৃত্ব। সিপিএমের আর এক তরুণ তুর্কি নেতা সইফুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ২০০০ সাল নাগাদ সিপিএম দলকে আরো মুক্তমনা, সমাজতান্ত্রিক করে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা সওয়াল করতে থাকেন। জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। যদিও তৎকালীন শীর্ষ নেতৃত্ব এর কোন দাবি মেনে নেননি। দলের ভিতরে সীতারাম ইয়েচুরি এবং প্রকাশ কারাতের তৎকালীন রাজনৈতিক লাইনের বিপক্ষে তাঁরা অবস্থান নেন। কংগ্রেস নয়, সম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি দেশের কাছে সবথেকে বড় বিপদ, এটাই সমীর পুততুন্ড এবং সইফুদ্দিন চৌধুরী মনে করতেন। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রয়োজনের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের চিন্তা ধারা যে কত সঠিক ছিল তা আজ প্রমাণিত। সিপিএম দল থেকে সম্মানজনক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজেদের দল গঠন করার পরে পিডিএস ২০০১ সালের নির্বাচনে ৯৮ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ব্যর্থ হয়। ২০০৪ এর লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০০৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করেও এই দল ব্যর্থ হয়েছিল। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে সরাসরি সমর্থন করে পিডিএস। জানা যায়, সমীর পুততুন্ডর পরামর্শ মতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার সুফল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন। নিজের তৈরি দল পিডিএস নির্বাচনে পর পর চরম ব্যর্থ হলেও রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সমীর পুততুন্ড কখনোই হারিয়ে যাননি। অংশ নিয়েছেন ছোট বড় বিভিন্ন আন্দোলনে। বন্ধু সইফুদ্দিনের অকাল মৃত্যুর পর সমীর পুততুন্ড এবং তাঁর স্ত্রী অনুরাধা দেব (পুততুন্ড) পিডিএস দলকে পরিচালিত করেছেন।

নাগরিকের সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

অর্ঘ্য সেন (১৯৩৫-২০২৬)

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৪ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন অর্ঘ্য সেন। তাঁর গাওয়া 'আমার মাথা নত করে' কিংবা 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে' গানগুলো এই প্রজন্মকেও ছুঁয়ে যায়। অর্ঘ সেনের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১১ নভেম্বর বাংলাদেশের ফরিদপুরে। ছোটবেলা থেকেই গানের সঙ্গে তাঁর সখ্য। কিশোর

বয়সে কলকাতায় আসেন তিনি। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুল শেষ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক পাশ করেন। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। তার পরে ন্যাশনাল সার্ভে অর্গানাইজেশন-এও কিছু দিন কাজ করেন।

ছোট থেকেই সঙ্গীতসাধনার শুরু। দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্র ছিলেন। রেডিয়োতে পঙ্কজকুমার মল্লিকের গান শুনে অনুপ্রাণিত হন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও শিক্ষা নেন। দেবব্রত বিশ্বাসের সান্নিধ্যে তাঁর গানের ভুবন নতুন করে গড়ে ওঠে। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত একটা আলাদা মাত্রা পেত। তবে অনেকেই জানেন না তাঁর হাতের কাজও ছিল দারুণ। অত্যন্ত ভালো সেলাই করতেন তিনি। সঙ্গীত এবং শিল্প দুই পরিসরেই তাঁর অনায়াস যাতায়াত ছিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিনি যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তা এককথায় অনন্য। অর্ঘ্য সেনের গলায়, রবীন্দ্রনাথের গান যেন রূপ পেত আরও গভীর অনুভূতির। তাঁর কণ্ঠে 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে' বা 'আমার মাথা নত করে দাও' শুধুই সুরেলা পরিবেশনা নয়, বরং শ্রোতার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যাওয়া এক আত্মিক অভিজ্ঞতা। সুর, ব্যাকরণ ও আবেগের অনন্য মেলবন্ধনে প্রতিটি গান হয়ে উঠত যেন এক ধ্যানমগ্ন সাধনা।

শুধু শিল্পী হিসেবে নয়, শিক্ষক হিসেবেও অর্ঘ্য সেন ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে হলে শুধু সুরের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন চরিত্র, অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও কবির ভাবধারাকে অনুধাবন করা। তাঁর স্নেহ, কঠোর অনুশাসন ও শিল্পদৃষ্টি থেকে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য প্রতিভাবান শিল্পী, যারা আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সমান নিষ্ঠায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষকের এই বিশাল অবদানের জন্যই তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছিলেন এক আলোকবর্তিকা।

তাঁর শিল্পসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৭ সালে তিনি লাভ করেন সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার। পরবর্তী সময়ে 'টেগোর ফেলো' সম্মানও তাঁর ঝুলিতে যোগ হয়, যা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অপূর্ব দিশারী হিসেবে। তবে পুরস্কারের চেয়ে তাঁর রেখে যাওয়া গানই আজ সবচেয়ে বড় স্মৃতি, যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে শান্তি, প্রশান্তি ও মাধুর্যে ভরিয়ে রাখবে।

ধারাবাহিক

জরুরি অবস্থা:
জনতা সরকারের ব্যর্থতা ও পতন

সুশান্ত. দাশগুপ্ত

(১০)

আগেই বলা হয়েছে জনতা পার্টির অভ্যন্তরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ওই দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সোশালিস্টদের একটি বড় অংশ দ্বৈত সদস্যপদের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যও থাকবে এবং জনতা পার্টির সদস্যও থাকবে এর ঔচিত্য নিয়ে সোশালিস্টদের একটি বড় অংশ প্রশ্ন তোলে। এই বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই কার্যত দ্বৈত সদস্যপদের পক্ষেই দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত চরণ সিংহ সোশালিস্টদের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জনতা পার্টির এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দুকে ব্যবহার করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আর এস এস-এর নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি সরকার গঠনে চরণ সিংহকে ব্যবহার করা। ঘটনাচক্রে সিপিআই দলও জনতা পাটির এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে চরণ সিংহকে সমর্থন জানায়, দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও সিপিএম শেষ পর্যন্ত চরণ সিংহকে সমর্থন। জানায়।

আর এস এস সম্পর্কে মধু লিমায়ে

সোশালিস্ট নেতা মধু লিমায়ে ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। রাম মনোহর লোহিয়ার সঙ্গে 'বর্ণভিত্তিক সমাজবাদ' নিয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন লোহিয়া অনুগামী। জরুরি অবস্থায় তিনি গ্রেফতার হন। তাঁর ধারণা ছিল ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা কখনই প্রত্যাহার করবেন না ও সংসদীয় নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে না। ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচন ঘোষণা ও সমস্তরকম বিধিনিষেধ প্রত্যাহার সম্পর্কে মধু লিমায়ের বক্তব্য ছিল মনে রাখতে হবে ইন্দিরা ও আমরা সকলেই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ফসল। সে পণ্ডিতজির কন্যা, ইতিহাসে সে চিরকালীন একনায়কতন্ত্রের প্রতীক হয়ে থাকবে এটি তাঁর (পড়ুন ইন্দিরার) কাম্য ছিল না। সর্বোপরি ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা পণ্ডিতজির উত্তরাধিকার সে বহন করছিল। তাই নির্বাচন আহ্বান করে সে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিল।' মধু লিমায়ে তীব্রভাবে দ্বৈত সদস্যপদের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মোহিত সেনকে বলেছিলেন, ফ্যাসিস্তদের ও তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বই পড়ে অনেক কিছু জেনেছিলেন।

কিন্তু বাস্তবে ফ্যাসিস্তরা কীভাবে তাদের কাজকর্ম চালায় তা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন ১৯৭৮-৭৯ সালে জনতা পার্টির মধ্যে থেকে আর এস এস-এর ভূমিকা দেখে। তিনি তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে অটলবিহারী বাজপেয়ীকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, বাজপেয়ী ছিলেন ভারতীয় ফ্যাসিবাদের, দর্শন ও কার্যধারার একজন পোড় খাওয়া সংগঠক। তাঁর মতে, এরা সামনে একরকম কথা বলে কিন্তু পিছন থেকে ঠিক তার বিপরীত কাজ করে। মধু লিমায়ে মনে করতেন বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে আর এস এস-এর যোগ আছে । তাদের সঙ্গে হয়তো সংঘের সব বিষয়েতত্ত্বগত মিল নেই কিন্তু এই ভারতীয় জাতি রাষ্ট্র যা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল তাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের অভিন্ন স্বার্থ ছিল। সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে জনতা পার্টির কার্যকালে আর.এস.এস-এর যেনতেন প্রকারেণ অনুপ্রবেশের বিষয়ে মধু লিমায়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। জনতা পার্টির সরকারের পতনে ইন্দিরা গান্ধির উদ্যোগের জন্য লিমায়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

চরণ সিংহ সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধি

আর এস এস ও দ্বৈতপদের প্রশ্নে সিপিআই ও সিপিআই(এম) চরণ সিংহকে সমর্থন করে। এই দুই পার্টি এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল যে ইন্দিরা গান্ধি জনতা পার্টির বিক্ষুব্ধদের সাহায্যে সরকার গঠনের কোনও চেষ্টা করবেন না। সিপিআই ও সিপিআই(এম)-এর কাছে চরণ সিংহ ছিলেন ইন্দিরা গান্ধির থেকেও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। যদিও পরবর্তীকালে সিপিআই (এম) ও সিপিআই উভয় দলই মনে করেছিল যে তাদের এই রাজনৈতিক পদক্ষেপের জন্যই ইন্দিরা গান্ধি ১৯৮০ সালে পুনরায় নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসেন। যদিও এর পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই কমিউনিস্ট পার্টিই অন্ধ ইন্দিরা ও কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে, যাদের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে মনে করে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করে এসেছিল।

কিন্তু চরণ সিংহ সম্পর্কে ইন্দিরা.গান্ধির মুল্যায়ন ছিল খুবই আগ্রহোদ্দীপন্থ। তিনি মোহিত সেনকে বলেছিলেন কোনও ভাবেই চরণ সিংহের সরকার কে স্থিতিশীল হতে দেওয়া যাবে না। তাঁর মতে, ভারতের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে চরণ সিংহের সরকার আগের সরকারের চেয়েও বেশি নেতিবাচক। ইন্দিরাজির মতে , চরণ সিংহের জাঠ অধ্যুষিত পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থান ছাড়া গোটা দেশ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। তিনি এমন একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি কোনও দিন মাদ্রাজ জাননি বলে গর্ব অনুভব করেন। বাংলা ও উত্তর পূর্ব ভারত সম্পর্কেও তিনি অজ্ঞ। শ্রী সিংহ ভারি শিল্পের বিরোধী কিন্তু সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকারের দৃঢ় সমর্থক।

চরণ সিংহ ও দুই কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৮০ সালের নির্বাচনের আগে দুই কমিউনিস্ট পার্টিই চরণ সিংহকে তাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র বলে মনে করে সমর্থন করে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, চরণ সিংহই হচ্ছেন সেই নেতা যাঁর ইন্দিরা গান্ধিকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় গণভিত্তি আছে। এরা একথাও মনে করেছিল যে ভারতীয় জনসাধারণের ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে যেহেতু ঘৃণা আছে তাই তিনি আর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না।

সিপিআই-এর জাতীয় পরিষদের ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে চরণ সিংহের মূল্যায়ন নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। রাজেশ্বর রাও একটি তত্ত্ব খাড়া করেন যে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে সর সময় 'শক্তিশালী অপেক্ষা 'দুর্বল বুর্জোয়াশ্রেণি' বেশি গ্রহণযোগ্য। চরণ সিংহ দুর্বল বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি অপর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধি শক্তিশালী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। তাই চরণ সিংহকে সমর্থন করাই শ্রেয়। আবার এর বিপরীতে গিয়ে রাও একথাও বলেন যে ইন্দিরা গান্ধির জনভিত্তি এখন খুবই দুর্বল, তাই তাঁর সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়াও নির্বুদ্ধিতা।

জাতীয় পরিষদের এই সভায় যখন এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া উপনিবেশিক শক্তি চায় এই দেশে একটি দুর্বল বুর্জোয়া সরকার থাকুক 'যে সরকারকে সহজেই অস্থিতিশীল করা যাবে বা প্রভাবিত করা যাবে। তখন তার উত্তরে বলা হয় যে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে একটি দুর্বল বুর্জোয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করাও সহজ এই কথাটাও মনে রাখতে হবে। CPI-এর এই বিশ্লেষণটি ছিল হাস্যকর ও পরস্পর বিরোধী।

১৯৮০ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি ও কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়লাভ করে।জনতা সরকারের তিন বছরের রাজত্বে ধর্ম ও জাতপাত নিয়ে দাঙ্গা ও সংঘর্ষে জনসাধারণ তিতিবিরক্ত ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্লোগান তোলে 'না জাত পর, না পাত পর ইন্দিরাজিকী বাত পর, মোহর লাগাইয়ে হাত পর'। আর যেখানে CPI ও বাম পন্থীদের উপস্থিতি ছিল সেখানে মানুষ শ্লোগান তোলে 'কম ডাঙ্গে কা বাত পর, মোহর লাগাইয়ে হাথ পর।'

সিপিআই নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে বাম ফ্রন্টে যোগ দেয়। কেরলে কংগ্রেস সিপিআই কোয়ালিশন ভেঙে দিয়ে সিপিআই

ওখানে সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দেয়। এই দুই রাজ্যে বামপন্থীদের নির্বাচনী ফল ভালো হয়। এই জয়কে রাজেশ্বর রাও তাঁর পার্টি লাইনের সাফল্য বলে দাবি করেন ও জাতীয় পরিষদে তাঁর গরিষ্ঠতা রাখতে সক্ষম হন। এইভাবে কার্যত সিপিআই (এম)-এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে সিপিআই দল আত্মবিলুপ্তির সূচনা করে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসে একটি ভাঙন হয়েছিল (১৯৭৮ সালে)। ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে বিরোধে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির নেতৃত্বে আরও একটি কংগ্রেসের জন্ম হয়। এই দলটিও নির্বাচনে গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৯৭৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনের আগে ইন্দিরা গান্ধি জ্ঞানি জৈল সিংহকে রাজেশ্বর রাওয়ের কাছে পাঠিয়ে ওই বিধানসভায় সিপিআইকে ৬০টি বা তার কিছু বেশি আসন দেবার প্রস্তাব করেন, যা রাজেশ্বর রাও প্রত্যাখ্যান করেন ও বলেন, তাঁরা ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করবেন। ওই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস জয়লাভ করে। সিপিআই ও রেড্ডি কংগ্রেসের বিপর্যয় হয়। ১৯৮০'র লোকসভা নির্বাচনের আগেও ইন্দিরা গান্ধি সিপিআইকে অন্তত ৭০টি লোকসভা আসন ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যা রাজেশ্বর রাও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধি এসএ ডাঙ্গের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ডাঙ্গে তাঁকে দলীয় পর্যায়ে কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। তবে ডাঙ্গে তাঁকে বলে ' You will triumph.'

(ক্রমশ)

দেশের খবর

এখন জেলই আমার জীবন
জামিনের আবেদন খারিজের পর
বললেন উমর খালিদ

অমিতাভ সিংহ

'এখন জেলই আমার জীবন' সুপ্রীম কোর্টে জামিনের আবেদন নাকচ হওয়ার পর এটাই ছিল ২০২০ সালে দিল্লী দাঙ্গায় সাজানো মামলায় অভিযুক্ত জেএনইউ এর উজ্জ্বল ছাত্র উমর খালিদের অভিব্যক্তি।২০২০ সালে দিল্লীতে সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন উমর,শরজিল ইমামসহ একাধিক মেধাবী ছাত্রনেতা ও নেত্রী। জানুয়ারি মাসে শরজিল ও সেপ্টেম্বর মাসে উমরসহ বিভিন্ন নেতাদের বিভিন্ন সময়ে বিজেপি সরকার রাষ্ট্রদোহ আইন ইউএপিএ- তে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পাঁচ বছরেরও বেশী সময় বিনা বিচারে জেলবন্দী করে রেখেছে। গত ৫ জানুয়ারি একই মামলায় গুলফিসা ফতিমা,মীরান হয়দার,শিফাউর রহমান,সালিম খান ও শাদাব আহমেদকে জামিন দিয়েছেন বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি এন.ভি আন্জারিয়া। বিচারপতিদ্বয়ের বক্তব্য উমর ও শরজিল এর ক্ষেত্রে নাকি প্রাথমিকভাবে অভিযোগের কিছু প্রমাণ রয়েছে।তাই বাকী পাঁচ জনকে জামিন দেওয়া গেলেও এই দুজনকে তা দেওয়া যাবে না।

আদালতের যুক্তি ছিল দিল্লী দাঙ্গায় এই দুজনের ভূমিকা অন্যদের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল ও পুলিশের পেশ করা তথ্যপ্রমাণ প্রাথমিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। আদালত এ কথাও বলে যে পাঁচ বছর ধরে কারাগারে থাকা ও মামলার বিচার শুরু না হওয়া বিষয়দুটি জামিন পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। অথচ তার ঠিক পরদিন অর্থনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত অরবিন্দ ধামাল জামিন পেলেন। তিনি ১৭ মাস জেলে ছিলেন। আদালত বলে সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলা একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে শেষ হবে। তা যদি না হয় তার দায় অভিযুক্তের নয়,রাষ্ট্রের।

এদিকে আশারাম বাপু ও বাবা রামরহিম যাদের ধর্ষণ ও অন্য নানা অপরাধে কারাদণ্ড হয়েছে, তারা প্রায় সময়ে প্যারল পেয়ে জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যার জন্য হাইকোর্ট যাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, তিনি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে জামিন পান , পরে অবশ্য তার জামিন বাতিল হয়।

মনে রাখতে হবে ইউএপিএ এর মামলায় দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর। অথচ শরজিল ইমামের প্রায় ছয় বছর ও উমর খালিদের সাড়ে পাঁচ বছর জেল খাটা হয়ে গেছে।এটাই আশ্চর্যের যে উমর ও শরজিল যতদিন বিনা বিচারে জেলে রয়েছেন তা এই বিচারপতিদ্বয়ের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। তাদের বিচারে যে দেরী হচ্ছে তা অসাংবিধানিক বলেও মনে হয়নি। আদালতের এই সিদ্ধান্ত মানুষের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে প্রহসনে পরিণত করল না কি? অথচ সুপ্রীম কোর্ট একাধিকবার বলেছে বিচারাধীনদের ক্ষেত্রে জামিন পাওয়াটাই আইন,জেল ব্যতিক্রম মাত্র। কদিন আগেই একটি মামলায় বিচারপতি মাহেশ্বরী তাঁর রায়ে বলেছিলেন অভিযোগ গুরুতর বলে বিচারাধীনকে নির্দোষ ধরে এগোনোর রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় না।মাত্র মাস তিনেক আগে বেঙ্গালুরু দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত দুজনকে জামিন দেওয়ার সময় সুপ্রীম কোর্ট বলেছিল

বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতে দেরী হলেও তাকে দীর্ঘকাল জেলবন্দী করে শাস্তি দেওয়া যায় না। সুপ্রীম কোর্ট বার বার বলেছে যে জামিন একটা মৌলিক অধিকার। তাহলে উমর- শরজিলের জামিন হল না কেন,বিশেষত তারা যখন পাঁচ বছরেরও বেশী জেলে কাটিয়ে ফেলেছেন। আসলে তারা মুসলীম সম্প্রদায়ের মানুষ। ২০১৪ সালে মোদীর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের হাত ধরে দেশজুড়ে আরএসএস এর পরিকল্পনায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের একটা দীর্ঘ পর্ব চলছে। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য একটা ঘৃণার বাতাবরণ সৃষ্টি করে ও একইসঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মুসলীম সমাজকে কোনঠাসা করে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা। জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি নষ্ট করে একটা ব্রাহ্মন্যবাদী উচ্চবর্ণের আধিপত্যবাদী সমাজ তৈরী করে দেশ শাসন করা। এই পরিকল্পনা করেই আরএসএস ভারতের সংবিধানের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানতে চেয়েছে।

ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ বলেছেন যে তিনিও তো ২০১৯ সালে ব্যাঙ্গালুরুতে সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন যখন উমর দিল্লীর শাহিনবাদে একই কাজ করছিলেন। কিন্তু আজ তিনি মুক্ত তার কারণ তার নাম রামচন্দ্র। সম্প্রতি তিনি একটি নিবন্ধে উমরের উচ্ছশিত প্রশংসা করে লিখেছেন, উমরের পিএইচডির গবেষণাপত্রটিতে সে ঝাড়খণ্ডের সামাজিক ও পরিবেশগত ইতিহাস অন্বেষণ করেছে। ব্রিটিশ যুগ থেকে এখন পর্যন্ত সিংভূম জেলায় আদিবাসী সমাজের রূপান্তর কিভাবে ধীরেধীরে এই অঞ্চলে সামরিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করল ও তার ফলে প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো পাল্টে গেল তা দেখানো হয়েছে। রামচন্দ্র গুহ যেটা বলতে চেয়েছেন তা হল দেশের মেধাদের এই সরকার জেলে বদ্ধ করে রাখতে চায়।তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে বা কথা বলতে দিতে চায় না বিজেপির সরকার।

শরজিল ইমাম মুম্বাই আইআইটি থেকে এমটেক করে জেএনইউ তে আধুনিক ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করছেন। একজন মেধাবী ছাত্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কি কারণে এই জেলবন্দী ?

২০১৯-২০ সালে সারা ভারত জুড়ে বিজেপি সরকারের আনা কালাকানুন এনআরসি ও সিএএ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।দিল্লীর শাহিনবাদে বিভিন্ন ছাত্রনেতা এই প্রতিবাদের সামনে ছিলেন। সেসময় দিল্লী দাঙ্গায় ৫৪ জনের মৃত্যু হয় যার বেশীরভাগই মুসলীম সম্প্রদায়ের। সময়টা জানুয়ারি ২৩/২৪ এর। কয়েক হাজার মানুষ গৃহহীন হন এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য। কয়েকশ শিশু অনাথ হয়ে পড়ে সারাজীবনের জন্য। সেসময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কিভাবে দাঙ্গায় পরিণত হল তার তদন্ত হল না কেন? দিল্লীর বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরের বক্তৃতায় বলেছিলেন ক্ষ্ম দেশ কো গদ্দারোকো, গুলি মারো শালেকো ক্ষ্ম এটা উস্কানিমূলক বক্তব্য নয়? বর্তমান দিল্লী সরকারের আইনমন্ত্রী কপিল মিশ্র, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাহেব সিং বর্মার পুত্র পরবেশ সাহেব সিং এরা প্রতিনিয়তই উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখে দাঙ্গা ডেকে এনেছেন।তারা বলেছিলেন ওরা ঘরে ঢুকে তোমাদের বাড়ীর মহিলাদের ধর্ষণ করবে,ওদের মারো। তাদের বিরুদ্ধে তো দিল্লী পুলিশ এফআইআর পর্যন্ত করে নি।এমনকি আদালত বলা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

ইউএপিএ আইনটা কি ?

এটি একটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন যার জন্ম ১৯৬৭ সালে। এই আইনে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যা এদেশে নিষিদ্ধ তাদের কোনও সদস্য যে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত তাকে গ্রেপ্তার করা যায়।২০১৯ সালে মোদী সরকার এই আইনে পরিবর্তন আনল। সংগঠনের সদস্য না হলেও একজন একক ব্যক্তিকেও সরকার মনে করলে এই আইনে গ্রেপ্তার করতে পারবে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে। এই আইনের ৪০(ডি) প্রয়োগে জামিন পাওয়া প্রায় অসাধ্য। যেকোনও সরকার- বিরোধী গণআন্দোলনকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করে ও তাদের বিনাবিচারে জেলবন্দী করে রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে। ভীমা কোরেগাও মামলায় দীর্ঘদিন জেলে অসহনীয় অবস্থায় কালযাপনের পর বৃদ্ধ কবি ভারভারা রাও সহ সবাই জামিন পেয়েছেন।

কি অপরাধে এই শাস্তি ?

উমরের অপরাধ শাহিনবাদে ও মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে এনআরসি বিরোধী প্রচার ও দিল্লী প্রোটেষ্ট সাপোর্ট নামে এক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার বক্তৃতার ভিডিও ক্লিপ ও স্লোগান বিকৃত করে তা প্রচার করে বিজেপির আইটি সেল। আসলে ভারতের মানুষের সহজাত সহনশীলতা ও বিবিধের মধ্যে ঐক্য চর্চার মন্ত্রটাই বর্তমান সরকারের ডিএনএ তে অনুপস্থিত। আর বর্তমানে বিচারপতিরা রীতিমত ভয় পাচ্ছেন অভিযুক্তদের জামিন দিতে,বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের।

গত এক দশকে ইউএপিএ বা দেশদ্রোহ আইনের প্রয়োগ বেড়েছে প্রবলভাবে।এইসময়ে আগের সরকারের সময়ের চেয়ে এই আইনে প্রতি বছর মামলা বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ করে। গত কয়েকবছরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে এই আইনে মাত্র ৩ শতাংশ অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। বাকী ৯৭ শতাংশ অভিযুক্তদের হয় বিচার শুরু হয়

নি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে গেছেন। উমর - শরজিলের বিচার আজও শুরু হয় নি। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি তাদের জামিনের আবেদন এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত ছিল। এই আমলে সরকার ইউএপিএ আইনটিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করছেন।বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্ব যদি জামিনের আবেদন খারিজ করার কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় তাহলে দেশে এক ভয়ঙ্কর একনায়কতন্ত্র ও একদলতন্ত্র তৈরী করবে। বহুদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের সলিল সমাধি ঘটবে। খাঁচার তোতার মত বর্তমান স্বশাসিত সংস্থাগুলির অস্তিত্ব বিলীন হবে। সেই কারণেই নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি ও আমেরিকান কংগ্রেসের অন্ততঃ আটজন সদস্যসহ বহু দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলি ভারতের বর্তমান বিচারব্যবস্থার প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে উমরদের নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন।

বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের মানবিক সংকট, তাণ্ডব হিন্দুত্ববাদি সাম্প্রদায়িক শক্তির

সুকুমার মিত্র

"Migration is an expression of the human aspiration for dignity– safety and a better future. It is part of the social fabric– part of our very makeéôéup as a human family." —— *বান কি মুন, জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব।*

কাজের খোঁজে রাজ্যের বাইরে পাড়ি দেওয়া বাংলাভাষী শ্রমিকদের জীবন আজ যেন এক অদৃশ্য আতঙ্কে বন্দি। প্রতিদিনের রুটি-রুজির জন্য দূর রাজ্যে গিয়ে শ্রম দেন, কিন্তু সেখানে তাঁদের ভাষা ও ধর্ম পরিচয়ই হয়ে উঠছে আক্রমণের কারণ। ছত্তিশগড়ের সুরজপুরে আটজন শ্রমিকের উপর বজরং দলের হামলা কিংবা ওড়িশার কটকে রাজা আলির উপর নির্যাতনের ঘটনা শুধু তাঁদের শরীরে ক্ষত তৈরি করেনি, ভেঙে দিয়েছে তাঁদের মানসিক শক্তি ও পরিবারের ভরসার স্তম্ভ।

পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া - ২ ব্লকের চাপরি গ্রামের শ্রমিকদের চোখে এখনও সেই ভয়াবহ রাতের আতঙ্ক স্পষ্ট, আর হুগলির গোঘাটের রাজা আলির পরিবার আজ দিশাহারা হয়ে পড়েছে ছেলের রোজগার হারিয়ে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের ছত্তিশগড়ের আশ্রয়কেন্দ্রে দিন কাটানো কিংবা অসুস্থ বাবার কান্নায় ভেঙে পড়া এইসব দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি শ্রমিকের পিছনে রয়েছে একটি পরিবার, একটি সংসার, একটি স্বপ্ন।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাগুলো শুধু নির্যাতনের নয়, বরং ভাঙা স্বপ্ন, ভেঙে পড়া সংসার আর নিরাপত্তাহীন জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব হলেও, সমাজেরও কর্তব্য তাঁদের পাশে দাঁড়ানো।

কাজের খোঁজে রাজ্যের বাইরে পাড়ি দেওয়া হাজারো বাংলাভাষী শ্রমিকের জীবন আজ আতঙ্কে জর্জরিত। ছত্তিশগড়ের সুরজপুরে আটজন শ্রমিকের উপর বজরং দলের হামলা কিংবা ওড়িশার কটকে রাজা আলির উপর নির্যাতনের ঘটনাগুলি শুধু ওই শ্রমিকদের নয়, তাঁদের পরিবারগুলোকেও গভীর মানসিক ও আর্থিক সংকটে ফেলে দিয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সারি সারি এই ঘটনাগুলো তুলে ধরলে বোঝা যায়, পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন কতটা ভঙ্গুর, কতটা অনিশ্চিত।

পুরুলিয়ার চাপরি গ্রামের শেখ জসিম, শেখ আসলাম, শেখ বাবি ও শেখ জুলফিকার কোনোভাবে পালিয়ে বাড়ি ফিরতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের চোখে এখনও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তাঁরা বলেন, 'আমরা শুধু ন্যায্য মজুরি চাইছিলাম। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি বলে মারধর করা হলো।'

বাকি চারজন শেখ ইসমাইল, শেখ মিনার, আরবাজ কাজি ও শেখ সাহিল যারা সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক, এখনও সুরজপুরের সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে। তাঁদের পরিবার প্রতিদিন উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। শেখ সাহিলের মা সাবিনা বিবি বলেন, 'আমার ছেলে সংসার চালাতে কাজ করতে গিয়েছিল। এখন মারধর খেয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আছে। আমি চাই সে দ্রুত বাড়ি ফিরুক।'

এই কথাগুলো শুধু এক মায়ের নয়, চাপরি গ্রামের প্রায় ৩০০ মুসলিম পরিবারের মনের আর্তি। তাঁদের অধিকাংশ সদস্যই বাইরে গিয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এখন তাঁরা আর বাইরে যেতে চান না, কিন্তু স্থানীয়ভাবে কাজের সুযোগ নেই। ফলে পরিবারগুলো এখন চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে।

হুগলির গোঘাটের বিরামপুর গ্রামের রাজা আলি পাথর মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন ওড়িশার কটকে। বাংলা বলায় তাঁকে আগেই হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি লুকিয়েই কাজ করতেন। কিন্তু ৭ জানুয়ারি রাতে ১০-১২ জন গেরুয়া আশ্রিত দুস্কৃতী মিলে তাঁর ভাড়া বাড়ির তালা ভেঙে ঢুকে তাঁকে মারধর করে এবং রোজগারের ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

রাজা আলি আতঙ্কে রাতারাতি ওড়িশা ছেড়ে পালিয়ে আসেন। তাঁর অসুস্থ বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন ছেলের উপর নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে। সংসার চলত ছেলের রোজগারে। এখন সেই রোজগার

নেই, সংসার চালানোর পথ নেই। পরিবারের সদস্যরা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। এই ঘটনাগুলি শুধু শারীরিক নির্যাতনের নয়, বরং মানসিক ভাঙনের কাহিনি। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তআমরা আর বাইরে কাজ করতে যেতে চাই না।দ কিন্তু তাঁদের পরিবার কীভাবে চলবে? স্থানীয়ভাবে কাজ নেই, বাইরে গেলে নিরাপত্তা নেই। এই দ্বন্দ্বই তাঁদের জীবনকে করে তুলেছে অসহনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার বলেন, 'একদিকে তাঁরা বাঙালি বলেই আক্রান্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে নিজের রাজ্যে ফিরে এসে কাজ পাচ্ছেন না। ফলে পরিবারগুলো ভয়াবহ আর্থিক ও মানসিক চাপে রয়েছে।'

সুরজপুরে আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা চারজনই ১৬ বছরের নিচে। তাঁদের মধ্যে শেখ সাহিলের বয়স মাত্র ১৪। এত অল্প বয়সেই সংসারের দায় কাঁধে নিয়ে কাজ করতে গিয়েছিল সে। কিন্তু কাজের জায়গায় তাঁকে মারধরের শিকার হতে হয়েছে।

এই শিশু-কিশোরদের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে কতজনই অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাঁদের শৈশব, কৈশোর কেটে যাচ্ছে শ্রম আর আতঙ্কে। ওড়িশা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও হরিয়ানায় বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর হামলার ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ভাষা ও পরিচয়ের কারণে তাঁদের বারবার আক্রমণের লক্ষ্য করা হচ্ছে। এর ফলে তাঁরা শুধু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন না, তাঁদের পরিবারও ভয়াবহ আর্থিক সংকটে পড়ছে। এই পরিস্থিতি শুধু ওই শ্রমিকদের পরিবারের জন্য সমস্যা নয়, গোটা সমাজের জন্যই উদ্বেগজনক। কাজের খোঁজে রাজ্যের বাইরে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ছত্তিশগড় ও ওড়িশার ঘটনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে ফের দেখিয়ে দিল যে বাংলাভাষী শ্রমিকরা বহিরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বারবার আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁদের পরিচয়, ভাষা ও ধর্মকে কেন্দ্র করে বারবার হেনস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে তাঁরা আর বাইরে কাজ করতে যেতে চান না। কিন্তু স্থানীয়ভাবে কাজের সুযোগ না থাকায় পরিবারগুলো চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে।

এই লেখার সময়ে খবর এলো গতকাল ঝাড়খণ্ডে বাংলাদেশি সন্দেহে ঝাড়খণ্ডে এক বাঙালি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।এর ফলে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়। মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীদের অভিযোগ, আলাউদ্দিন শেখ (৩৬) নামে ওই শ্রমিককে খুন করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ১৬ জানুয়ারি বেলডাঙায় রেললাইন ও ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। আলাউদ্দিন শেখ বেলডাঙা থানার কুমারপুর পঞ্চায়েতের সুজাপুর তালপাড়ার বাসিন্দা। প্রায় পাঁচ বছর আগে কাজের সন্ধানে ঝাড়খণ্ডে গিয়ে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন তিনি। পরিবারের দাবি, বাংলাদেশি সন্দেহে বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে হেনস্তা করা হচ্ছিল। মৃত্যুর আগেও এই আতঙ্কের কথা পরিবারকে জানিয়েছিলেন আলাউদ্দিন।শুক্রবার সকালে ঝাড়খণ্ডে তাঁর ঘর থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া দেহ উদ্ধার হয়। তবে পরিবারের অভিযোগ, দেহের অবস্থান দেখে এটি আত্মহত্যা নয়, পরিকল্পিত খুন।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রতিটি শ্রমিকের পিছনে রয়েছে একটি পরিবার, একটি সংসার, একটি স্বপ্ন। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, সমাজেরও কর্তব্য।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন আজ ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত। তাঁদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও জীবিকার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো মানে শুধু শ্রমিকদের নয়, তাঁদের পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাশে দাঁড়ানো।

ভোটাধিকার বনাম লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি

সুকুমার মিত্র

গণতন্ত্রের শক্তি নিহিত থাকে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে। সেই অংশগ্রহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ভোটাধিকার, যা নাগরিকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছে এই ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলেছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত করা;অর্থাৎ, দেশের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক যেন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে কোনও বাধা না থাকে।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন বা এস.আই.আর (Special Intensive Revision) নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা গণতন্ত্রের এই মৌলিক ভিত্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর লজিকাল ডিসক্রেপ্যান্সি সিস্টেম চালু করা

হলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই প্রযুক্তি নির্ভর প্রক্রিয়ায় অসংখ্য প্রকৃত ভোটারের তথ্যকেই "Illogical" হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ফলে কোটি কোটি ভোটারকে নতুন করে প্রমাণপত্র জমা দিতে হচ্ছে, যা জনমানসে ক্ষোভ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে এস.আই.আর বিতর্ক কেবল একটি প্রশাসনিক জটিলতা নয়, বরং গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র, প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা এবং জনঅধিকার রক্ষার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে। তাই এই আলোচনায় প্রয়োজন যুক্তি, মানবিকতা এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সমস্যার গভীরে পৌঁছে সমাধানের পথ খোঁজা।

এস.আই.আর-এর আবির্ভাব

২০২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন বা এস.আই.আর (Special Intensive Revision) নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা গণতন্ত্রের এই মৌলিক ভিত্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে, প্রচলিত প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকায় এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর লজিকাল ডিসক্রেপ্যান্সি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল ভোটার তালিকার শুদ্ধতা বাড়ানো, ভুয়ো নাম বাদ দেওয়া এবং প্রকৃত ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই প্রযুক্তি নির্ভর প্রক্রিয়ায় অসংখ্য প্রকৃত ভোটারের তথ্যকেই "Illogical" হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ফলে কোটি কোটি ভোটারকে নতুন করে প্রমাণপত্র জমা দিতে হচ্ছে, যা জনমানসে ক্ষোভ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। আর এই প্রমাণপত্রের ক্ষোত্রে নির্বাচন কমিশনের খাম খেয়ালিপনায় নাভিশ্বাস রাজ্যের প্রকৃত নাগরিকদের। অসুস্থ, শতায়ু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধী, বিশেষভাবে সক্ষমদের কাছে শুনানির জন্য কমিশনের আধিকারিকদের যাওয়ার কথা থাকলেও সেই সব ঘোষণা নির্বাচন সদনের ফাইলে বন্দী হয়ে থাকছে। এদেরকে ১০-১৫ কিলোমিটার দূরে শুনানির জন্য এক গাদা তথ্য নিয়ে গিয়েও সন্তুষ্ট করতে পারছেন না কমিশনের মাইক্রো অবজারভারদের। সাধারণ নাগরিক তো বটেই সামরিক বাহিনীর পদস্থ অবসরপ্রাপ্ত কর্তা থেকে শুরু করে বি.এল.ও এবং তাঁর পরিবারও লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সির জন্য শুনানিতে যেতে হচ্ছে। শুনানির নোটিশ কবি জয় গোস্বামী থেকে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন সকলকে পাঠানো হয়েছে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করা খেলোয়াড় থেকে শুরু করে মহাকাশ বিজ্ঞানী কেউ বাদ নেই শুনানির তালিকায়। ডাক পেয়েছেন নৌ বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান। হ্যাঁ, বিজেপি-র কোনও তারকাকে এ পর্যন্ত শুনানিতে ডাকা হয়েছে এমন দাবি রাজ্য বিজেপির কর্তারা করতে পারছেন না। এও এক ম্যাজিক!

প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা

প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল সমস্যা হল তথ্যের অর্থাৎ ডেটার প্রেক্ষাপট বোঝার সীমাবদ্ধতা। নামের বানান ভিন্নতা, ঠিকানার পরিবর্তন, স্থানীয় ভাষার ব্যবহার;এসবকে AI প্রায়ই ক্ষুদ্রত্রুটিক্ষুদ্র হিসেবে ধরে নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভোটারের নাম যদি সরকারি নথিতে 'সুব্রত' হয়, কিন্তু ভোটার তালিকায় 'সুব্রতো' লেখা থাকে, তবে AI সেটিকে অমিল হিসেবে গণ্য করছে। অথচ বাস্তবে এটি কোনও ভুয়ো তথ্য নয়, বরং ভাষাগত ভিন্নতা। একইভাবে, ঠিকানার পরিবর্তন বা স্থানীয় উচ্চারণের কারণে তথ্যের সামান্য পার্থক্যকে AI "Illogical" হিসেবে চিহ্নিত করছে। এর ফলে প্রকৃত ভোটারদের তথ্যই বাদ পড়ছে। ছয় সন্তান বা তার বেশি পিতা মাতার নামের সঙ্গে থাকলে তাদেরকেও শুনানির জন্য ডাকা হচ্ছে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের বয়সের পার্থক্য ১৫ বছর বা তার কম থাকলে তাঁদেরকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। আবার মায়ের সঙ্গে সন্তানের বয়সের পার্থক্য ৫০ বছরের বেশি হলে শুনানিতে যেতে হবে তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হ্যাঁ এই তথ্য সঠিক। ভাবুন তো আমাদের মা-বাবার বা তাঁদের সঙ্গে তাঁদের মা-বাবার বা সন্তান-সন্ততির বয়সের ওই ফারাকের বিষয়টি কোন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করবেন। এরপর হয়তো বলা হবে দাইমা-কে শুনানিতে আসতে হবে। সেই দাই-মা যদি জীবিত না থাকেন তাহলে নতুন দিল্লির নির্বাচন সদন কোন ফরমান জারি করবেন তা তিনিই জানেন।

জনঅসন্তোষ ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

এই পরিস্থিতি জনঅসন্তোষকে বাড়িয়ে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে, প্রকৃত ভোটার বাদ পড়ে যাওয়া আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। বিরোধী দলগুলি বলছে, এটি ভোটার দমন নীতি। সাধারণ মানুষ বলছেন, ভোটাধিকার প্রয়োগে অযথা হেনস্থা হচ্ছে। গণতন্ত্রে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা যেমন জরুরি, তেমনি অন্তর্ভুক্তি ও সহজলভ্যতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রকৃত ভোটারদের বাদ দেওয়া হয়, তবে তা গণতন্ত্রের মূল সুরকেই ক্ষুণ্ণ করে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ও উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় বিডিও অফিসে জনরোষ আছড়ে পড়ার প্রেক্ষাপপট তৈরি করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশনের খাম খেয়ালিপনা। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে ১০ হাজার থেকে প্রায় ৮০ হাজার ভোটারকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হচ্ছে। নাম, জাত, ধর্ম দেখে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠছে শুনানির ধরণ দেখে। মতুয়া, রাজবংশী থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বেশি বেশি সংখ্যায় শুনানির নোটিশ পাঠিয়ে

হেনস্থা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য একজন এ.ই.আর.ও পদত্যাগ করেছেন। বহু বিধানসভা এলাকায় দলে দলে বি.এল.ও-রা একই অভিযোগ তুলে গণ পদত্যাগের আবেদন জানিয়েছেন। কাকস্য পরিবেদনা ! কোনও পক্ষেই কোনও অভিযোগ মেনে কাজ করা তো দূরের কথা বরং খসড়া তালিকা বিজেপি-র মনপুতঃ না হওয়ায় বেশি বেশি বাছাই করা ভোটারদের বাদ দেওয়ার নামই কি লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠতে শুরু করেছে। বারবার রাজ্যের শাসক দলের পক্ষগ্ধ থেকে লজিক্যাল ডিসক্র্যাপেন্সি রয়েছে এমন ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করার দাবি তোলা হলে সেই বিষয়ে কর্ণপাত করেননি ভারতের নির্বাচন কমিশন।

গণতন্ত্র বনাম প্রযুক্তি

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে;প্রযুক্তি কি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছে, নাকি দুর্বল করছে? প্রযুক্তি মানুষের সহায়ক, কিন্তু মানবিক যাচাই ছাড়া প্রযুক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া গণতন্ত্রে বিপজ্জনক। জ্জ্জ-এর সীমাবদ্ধতা হল, এটি মানুষের অভিজ্ঞতা, ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সামাজিক বাস্তবতা বোঝে না। তাছাড়া তাকে যে বিষয়গুলি দেখতে বলা হচ্ছে এ.আই তার উপর নির্ভর করে শুনানির নোটিশ পাঠাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বলতেই হবে প্রযুক্তি যদি দেশের মানুষের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে, তবে তা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। ভারতের নির্বাচন কমিশন সেই হুমকির সামনে দেশের নাগরিকদের দাঁড় করিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বলই করছেন।

সমাধানের পথ

এই প্রেক্ষাপটে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। প্রথমত, মানবিক যাচাই বাড়ানো জরুরি। জ্জ্জ-এর পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে কর্মীদের সরাসরি যাচাই প্রক্রিয়া চালু করা প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, ডেটা বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে। নাম, ভাষা, ঠিকানার ভিন্নতা জ্জ্জ মডেলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, অভিযোগ নিষ্পত্তি দ্রুত করতে হবে। ভোটার বাদ পড়লে সহজে পুনঃনিবন্ধনের সুযোগ দিতে হবে। চতুর্থত, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে প্রতিটি বাদ পড়া নামের যুক্তি প্রকাশ করতে হবে। পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক আস্থা পুনর্গঠন করতে হবে। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে জনবান্ধব করতে হবে। এই বিতর্ক কেবল পশ্চিমবঙ্গের নয়, গোটা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য একটি সতর্কবার্তা। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। একদিকে প্রযুক্তি স্বচ্ছতা বাড়াতে পারে, অন্যদিকে মানবিক বাস্তবতা উপেক্ষা করলে তা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। তাই প্রযুক্তি ও মানবিক যাচাইয়ের সমন্বয়ই হতে পারে প্রকৃত সমাধান। আর এই কাজটি যথাযথ করতে তড়িঘড়ি পথে নয়, প্রয়োজন ছিল আরও কিছু বেশি সময় ধরে করার জন্য বেশ কয়েক মাস আগেই এস.আই.আর শুরু করা।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গে এস.আই.আর বিতর্ক আমাদের সামনে এক গভীর বাস্তবতা তুলে ধরেছে;গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি ভোটাধিকারকে রক্ষা করতে হলে প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি মানবিক সংবেদনশীলতা অপরিহার্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে আধুনিকতার প্রতীক, কিন্তু যখন তা মানুষের মৌলিক অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তখন তা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা ও আস্থা বৃদ্ধি। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত ভোটাররা বাদ পড়ছেন, তাঁদেরকে অযথা শুনানিতে যেতে হচ্ছে, এবং সমাজের বিশিষ্টজন থেকে সাধারণ মানুষ;সবাইকে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। কোনও ক্ষেত্রেই যে সব কাগজ পত্র ভোটাররা নিজেদের স্বপক্ষে জমা দিচ্ছেন তার প্রাপ্তি স্বীকার করা হচ্ছে না । বলা হচ্ছে Election Commission এর নির্দেশ নেই । ক্ষণে ক্ষণে E. C নির্দেশ পালটাচ্ছে। সর্বশেষ বলা হয়েছে ডেট অফ বার্থ এর ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের Admit Card গ্রাহ্য হবে না ।

গণতন্ত্রে প্রযুক্তি কখনও মানুষের উপরে নয়, বরং মানুষের সহায়ক হিসেবে কাজ করা উচিত। তাই নির্বাচন কমিশনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা। মানবিক যাচাই প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে, অভিযোগ নিষ্পত্তি সহজ করে, এবং প্রযুক্তিকে মানুষের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। অন্যথায় গণতন্ত্রের মূল সুর;অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ;ক্ষুণ্ণ হবে। পশ্চিমবঙ্গের এই অভিজ্ঞতা গোটা দেশের জন্য একটি সতর্কবার্তা। ভোটাধিকারকে রক্ষা করতে হলে প্রযুক্তি ও মানবিকতা দুটির সমন্বয় অপরিহার্য। গণতন্ত্রের শক্তি মানুষের আস্থায় নিহিত, আর সেই আস্থা ফিরিয়ে আনাই এখন নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

বন্ধুতার পাতা

সংকলন : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

একা থাকা

কেউ যে কানা, কেউ খোঁড়া
এটা রটায় দুর্মুখরা
কেউ যে কালো, কেউ খোনা
সেটাও কোনো দুঃখ না
কেউ বেশি, কেউ কম জানে
কেউ পুজো, কেউ রমজানে
মন যদি তাও এক থাকে
তুচ্ছ এসব ব্যাখ্যা কি

শঙ্খ ঘোষ
রাগ কোরো না রাগুনি

বিখ্যাত কার্টুন চিত্রকর
প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী
ইংরেজি ভাষার ছবিতে সই
করতেন 'পিসিয়েল',
বাংলায় কাফী খাঁ

সরকারি জমি দখলের অভিযোগে জম্মুতে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এক মুসলিম সাংবাদিকের পৈতৃক বাড়ি। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নির্দেশে ওই সাংবাদিকের বাড়ি ভেঙে দিয়েছে জম্মু ডেভেলপমেন্ট অথরিটি।

এর খবর করে জম্মুর নারওয়ালের এক টুকরো জমিতে গড়ে ওঠা একতলা বাড়িটি ছিল গুলাম কাদির দাইং-এর পরিবারের আস্তানা।

দাইংদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর হিন্দু প্রতিবেশী কুলদীপ শর্মা।

নিজের জমি থেকে প্রায় ১ কাঠা জমি তিনি দান করেছেন বৃদ্ধ প্রতিবেশীকে। তার কথায় আমার ভাইকে আশ্রয়হীন হতে দেবো না।

২

ভোপাল ওরা তিন শালা
ও মালায় ১ কপি
তার পরে দিয়েছে আমি
গলাসকে ও শালী তার
দিয়েছি।
ওরা এখানেই থাকবে।
কুলীনদের বই উপহারে
আশুতো ঘাঁইং পরিবার

ঐ সময় / ২৯ নভেম্বর ২০২৫

আখতার আলি,
টেনিস খেলোয়াড়।
১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪
ভারতের লন টেনিস দলের
ডেভিস কাপ চ্যাম্পিয়নশিপের
সদস্য।
২০০৮ সালে দলের
নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন।
পুত্র জিশান আলি জাতীয়
টেনিস চ্যাম্পিয়ন, ভারতের
ডেভিস কাপ দলের সদস্য।
খেলা ছেড়ে দেবার পর আখতার
আলি টেনিস কোচ।

তিনি রমেশ কৃষ্ণান, বিজয়
অমৃতরাজ, আনন্দ অমৃতরাজ,
লিয়েন্ডার পেজ এবং সব
বিখ্যাত লন টেনিস খেলোয়াড়-
দের কোচ।
২০০০ সালে অর্জুন পুরস্কার
পাওয়া।

স্বামী বিবেকানন্দের
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
কলকাতায় গোলপার্কে
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট
অফ কালচার-এর
অনুষ্ঠানে সরোদ বাজালেন
আমান আলি খান ও
আয়ান আলি খান।

কলকাতার অলিতে গলিতে
একদা দেখা যেত
ভিস্তিওয়ালাদের। ছাগচর্মে
তৈরি ভিস্তি বা মশকে জল
ভরে, কাঁধে পিঠে চাপিয়ে
পথ চলা— ফুটপাথের

৩

ধরে রেখেছেন ও বাড়িয়েছেন
জলের যোগান দিয়ে।
এদের একজন মোহন্তী।

মোহন্তী এতটা বয়সে বাবার
হাত ধরে বিহার থেকে
কলকাতায় আসে। বাবার
পেশা ধরেই নিজেও
ভিস্তি ওয়ালা।
আলোকচিত্রী বিক্রম চৌধুরীর
ক্যামেরায় এদের ছবি।
এদের ছবি রেখে খবরের
ক্যালেন্ডার বানিয়েছে
বিক্রম।

অনিলবাবার পত্রিকা ২৩/১/২০২৩

নিয়ম করে প্রত্যেক শুক্রবার
নমাজ পড়েন মহম্মদ
আনসারি। গ্রাম কুলডি,
ব্লক পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া।
রমজান মাস জুড়ে রাখেন
রোজা।
আনসারি খেলা ভাসান
পালায় খেলা, মহিষাসুর
মর্দিনী শ্রীপালায় তিনিই
দলের মূল গায়েন।
দেবী বন্দনার স্তুতি
মূলত গান তিনি মূল
কণ্ঠশিল্পী।
মহিষাসুর মর্দিনী শ্রী-পালায়
তার কণ্ঠে গণেশ বন্দনা
বা দুর্গাস্তব শুনে হাততালিতে
ফেটে পড়ে আসর।

দলের ওস্তাদ তপন মাহাতোর
কথা — মহম্মদ আনসারি
আগে আমাদের দলে বাজনা
শিল্পী হিসেবে যোগ দিয়েছিল।
ঢোল বাজাতো, যাদের দলে
খেলার ভূমিকায় অভিনয়
করতো। পরে বুঝতে পারি
মহম্মদের গানের গলাও ভালো।
এখন ও দলের মূল গায়েন।
পালা শুরুর আগে গণেশের
বন্দনাই হোক বা দুর্গা স্তুতি
মহম্মদের সুরেলা গলা
মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে দর্শকদের।
তীর- হিড়িম্বা, নরকাসুর বধ,
কালনেমি বধ থেকে পুরাণভিত্তিক

৪

এরপর এক পাড়ায়
সব গানেই রফিসাহেবের
একটি বিচরণ।
দলের সহশিল্পী যেমন
বাদ্যকরের কথায় ভেসে
বাইরে গেলে বা ফিরলে
শুক্রবার ঠিক নমাজ
পড়ে নেয় আপত্তি
নেই।
সুরের দিকটা খুব সহজ
ছিল না।
খেলা তোমার পাড়ায়
খেলার ভূমিকা, যেই
পাড়ায় প্রবেশ করলাম,
দুগান্তর নিয়ে একেবারেই
আপত্তি জানিয়েছিল।
মহম্মদ বলছেন —
'ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ
বলেই আপত্তি আসতো,
কত বিরক্তির মধ্যে যে সুস্থ
হয়েছে। তবে আমি
হাল ছাড়িনি।
নিজস্ব ধর্ম আচরণে
আমি বরাবর সৎ
থেকেছি।
শিল্পীর কোনো
জাত ধর্ম হয় না'

এই সময় ৬ জানুয়ারি
২০২৫.

কলকাতায় মুসলমান
ও হিন্দু পাশাপাশি
ঘন বসতি এলাকা

কলুটোলা
বড়বাজার
বৌবাজার
কলিঙ্গা
পার্ক স্ট্রিট
বাগান বস্তি

সূত্র : সেনসাস অফ
ক্যালকাটা
রেকর্ড ১৯০১ – ১৯৩১